প্য ইন দ্য বটল

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

স্টেশন থেকে এস্কালেটরে 2
দুষ্প্রাপ্য বইয়ের দোকান 68
দেশলাইটা জোরে ছুঁড়ে ফেলে..........135
পিকাডিলি হোটেলের লবিতে..........206

স্টেশন থেকে এস্কালেটরে

হ্যারি গ্লেব, নিউ বন্ড স্ট্রীটের স্টেশন থেকে এস্কালেটরে উঠে এল। বৃষ্টি পড়ছে ঝম ঝম্ করে। ফুটপাত জলে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল হুড়হুড়িয়ে নর্দমায় ঢুকছে। হতাশ হ্যারি গেটে দাঁড়িয়ে বিরক্তিতে রাতের আকাশের দিকে চাইল। আকাশের চেহারা অপ্রসন্ন, কালো মেঘে ঢাকা।

হ্যারি রেগে গিয়ে ভাবল, আমার পোড়া কপাল! ট্যাক্সি পাবার কোন আশাই নেই। জাহান্নামে যা সব। আমাকে হেঁটেই যেতে হবে দেখছি। দেরী হলে বুড়ী মাগী রেগে লাল হয়ে যাবে। শার্টটা সরিয়ে কবজিতে সোনার ঘড়ি দেখে ভাবল, ঘড়ি যদি ঠিক সময় দেয়, তবে আমার দেরী হয়ে গেছে।

একটু ইতস্ততঃ করে হ্যারি কোটের কলার তুলে ভিজে ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় খিস্তি করতে লাগল। বৃষ্টির ঝাপটা থেকে মাথা বাঁচাতে মাথাটা নিচু করে চলতে লাগল।

টুপির কানা বেয়ে বৃষ্টি পড়ছে, পায়ে এসে পড়ছে বৃষ্টির ছাঁট। তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি বিড়বিড় করল, হতচ্ছাড়া দিনটার বজ্জাতি এবার কানায় কানায় পূর্ণ হলো। সিগারেটের ব্যাপারটা ঝুল খেল, হতভাগা কুকুরটা রেসে চারনম্বরে এল, চল্লিশ শিলিং একেবারে জলে গেল, আর তারপর এখন এই হাড় জ্বালানো বৃষ্টি!

বহুদিনের অভ্যাসমতো হ্যারি পথের আলো থেকে গা বাঁচিয়ে ছায়ায় ছায়ায় হাঁটছিল। নিউ বন্ড স্ট্রীটের মাঝামাঝি এসেই ও সামনের লোকটার ইস্পাতের বোতাম দেখে বুঝল এ নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। তখনি ও রাস্তা পেরিয়ে গেল।

ঘাড়টাকে কুঁচকে ও এমনভাবে উঁচু করল যেন এখুনি একটা ভারী থাবা ওর ঘাড়ে এসে পড়বে। মনে মনে ভাবল, ওয়েস্ট এন্ড এখন ভীড়ে ঠাসা। ওঃ! লোকটা ষাঁড়ের মতো পেল্লায় জোয়ান, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছে না, স্রেফ জাক দেখাচ্ছে। এটাকে কয়লাখনিতে নামিয়ে দিলে বরং কাজ দেবে ঢের বেশী।

পুলিশটার থেকে শতখানেক দুরে এসে ও আবার রাস্তা পেরিয়ে মে ফেয়ার স্ট্রীটে ঢুকল। কয়েক গজ হেঁটে ও পেছন ফিরে চাইল। যখন পুরোপুরি বুঝল কেউ ওকে লক্ষ্য করছেনা ও কোথায় যাচ্ছে, তখন একটা পুরোন বইয়ের দোকানের পাশের দরজা দিয়ে ও একটা ঢাকা বারান্দায় ঢুকল। জায়গাটা আলো–আঁধারি।

পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ছাতা বগলে একটা মেয়ে নামছিল। ভুরু আর চুল সাদা, পরনে চামড়ার জ্যাকেট, ফ্লানেলের প্যান্ট। হ্যারিকে দেখে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। চড়া রঙ মাখা মুখখানা ঝলমল করে উঠল।

–আমায় দেখতে আসছিলে সোনা?

–প্রাণ থাকতে নয়। আমার টাকা খরচের অনেক রাস্তা আছে। হ্যারি খ্যাক করে উঠল। তারপর মেয়েটির ঠোঁট কুঁচকে যেতে দেখে একটু নরম গলায় বলল, ফ্যান, আজ বাতি–

টাতি সব নিভিয়ে দাও। আজ পথে কোন খদ্দের নেই। এই অসম্ভব বৃষ্টিতে পথে পুলিশ ছাড়া কেউ নেই।

–তুমি তো আছো! মেয়েটি টোপ ফেলে বলল।

হ্যারির খারাপ লাগল। ওয়েস্ট এন্ডের সব বেশ্যার সঙ্গে ওর চেনাজানা আছে। হ্যারি জানে ফ্যান বুড়িয়ে যাচ্ছে, ওর সময়টা খারাপ যাচ্ছে, এখন ওর লাইনের অবস্থাটা এমন যে পারলে ওর গলা কাটে।

টুপি থেকে জল ঝেড়ে ফেলে হ্যারি বলল, দুঃখিত ফ্যান! এখন আমি ব্যস্ত আছি, কাজ আছে! কেউ ওপরে গেছে কি?

–বের্নস্টাইন, আর, আর সেই ছুঁচোটা, থিও। শুয়োরের বাচ্চা আমায় আধ ডলার দিতে চাচ্ছিল।

হ্যারি হাসি চাপল।

–থিওর কথা নিয়ে ভেব না। কেউ ভাবে না। চিরকাল ও বদ রসিকতা করে।

মেয়েটির চোখ রাগে জ্বলে উঠল।

–একদিন এমন টাইট দেব বুঝবে। অনেক পকের পোকা দেখেছি আমি, কিন্তু ও ছুঁচোটা আমায় যে সব কথা বলে, গা গুলিয়ে ওঠে একেবারে।

হ্যারি আলগোছে বলল, আমার তো ওর মুখ দেখলেই গা গুলোয়। আচ্ছা ফ্যান, চলি।

–কাজ শেষ হলে এসো আমার কাছে। ভালো জমবে, সত্যি বলছি।

হ্যারি শিউরে উঠল।

–যাব খন একদিন, তবে আজ রাতে নয়। আমি ডানাদের বাড়ি পৌঁছব আজ। নাও, দেখি হাতের মুঠোটা?

ওর হাতে দু–পাউন্ডের নোট গুঁজে দিয়ে হ্যারি বলল, যা হয় একটা কিনে নিও।

মেয়েটি লোপ আগ্রহে নোট দুটো নিল।

ধন্যবাদ হ্যারি। তুমি বড় ভালো ছেলে।

–জানি। হ্যারি হাসল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবল, বেচারা! রদ্দি হয়ে গেছে একেবারে। মোটা বুড়ি! বলে কিনা জমবে ভালো, হেঃ!

সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি দরজার সামনে দাঁড়াল হ্যারি। দরজায় লেখা–

মিসেস ফ্রেঞ্চ,
পরিচারক, পরিচারিকা সরবরাহ প্রতিষ্ঠান,
ভিতরে অনুসন্ধান করুন।

ঠিক এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারপর রেলিং দিয়ে ঝুঁকে দেখল ফ্যান বৃষ্টির মধ্যে ছাতা খুলে পথে নেমে এগিয়ে গেল। মাথা নেড়ে কাধ ঝাঁকিয়ে হ্যারি দরজায় টোকা মারল।

ঘরে আলো জ্বলে উঠল। একটা মেয়ে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

–এই যে! আমি যথারীতি দেরী করে এসেছি। হালকা মেজাজে হ্যারি বলল।

–এস হ্যারি। ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

করতে দাও।

মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে ওর ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে চুমো খেল। মেয়েটির ঠোঁট দুটো নরম, ওর ঠোঁটের সঙ্গে গলে মিশে গেল।

–এত কড়া দেখাচ্ছে কেন তোমায়? আঁ? গত রাতের পরেও?

রাতের কথা বোল না। মেয়েটি হেসে বলল, আজ সকালে যা মাথা ধরেছিল না।

হ্যারি ভাবল, যেমন হীরের মতো কঠিন আর সুন্দর, তেমনি চড়া দামও বটে।

চল হ্যারি, ওরা অপেক্ষা করছে। আর মাকে তো তুমি জানই।

সুন্দর আঙুলে ও হ্যারির মুখে আদরের ছোঁয়াচ বোলাল।

ওর কোমর জড়িয়ে ধরল হ্যারি।

–তোমার মা কি চায়? কয়েক হপ্তা দেখা না হওয়ার কারণে এখন আর আমার দেখা করতে কোন ইচ্ছে নেই। তোমার মার সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়া।

–বোকামি কোর না হ্যারি। এস, আঃ আবার ও রকম করছ? সত্যি, তোমার হাত একটু সামলাও এবার।

হ্যারি মুচকি হেসে মেয়েটির পেছন পেছন অফিস কামরা পেরিয়ে ভেতরের ঘরে এলো। একটা বড় টেবিল, তার ওপর একটা টেবিলল্যাম্প। আর কোন আলোনা জ্বলায় এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা আলো–আঁধারি।

মিসেস ফ্রেঞ্চ টেবিলে বসে আছেন। সিডনি বের্নস্টইন আর থিও ওঁর মুখোমুখি বসে। হ্যারি ঢুকতেই সবাই ওর দিকে তাকাল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ধারালো গলায় বললেন, তোমার দশমিনিট দেরি হয়েছে।

মহিলা মোটা থলথলে, গায়ের রং পাংশুটে হলদে। চোখ দুটো শানিত, চঞ্চকে। কানে দুটো দুল ঝুলছে। টেবিলল্যাম্পের আলোয় দুল দুটো ঝিমিক্ করছে।

হ্যারি দিব্যি বেপরোয়া চালে বলল, উপায় ছিল না। কান পেতে শোন বাইরে কোন ঝনঝ করে বৃষ্টি পড়ছে। ট্যাক্সি পেলাম না, হেঁটে আসতে হলো।

ও ওভারকোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল চেয়ারে, এই যে সিড! কেমন চলছে বলো? ও কে? অন্ধকারে নখ কামড়াচ্ছে? আমাদের থিও না? কি হে থিও, ছুলি, ব্রণ সব কেমন আছে?

জাহান্নামে যাও! থিও অন্ধকার থেকে খেঁকিয়ে উঠল।

হ্যারি খোলা গলায় হাসল। তারপর বলল, যাকে বলে গোপাল ছেলে। এবার টেবিলে হাত রেখে মিসেস ফেঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে এবার তো আমি সশরীরে হাজির। না আসার চেয়ে দেরীতে আসাও ভালো। কি, ব্যাপার কি?

ডানা অধৈর্য হয়ে বলল, তাড়াতাড়ি বলে ফেল মা। আমি শুতে যেতে চাই।

বস হ্যারি।

কাছের একটা চেয়ারে বসতে বললেন মিসেস ফ্রেঞ্চ, অনেকদিন হয়ে গেল। এখন একসঙ্গে একটা কারবার করতে হয়।

হ্যারি বসল।

–তাই না কি? জানি না।

এক প্যাকেট প্লেয়ার্স সিগারেট বের করে হ্যারি একটা ধরিয়ে বের্নস্টাইনকে প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পুলিশ তো পিছু লেগেই আছে। দেখেছ কাল রাতে প্যারিকে কিভাবে ধরল? বেচারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি অমনি ধরে নিয়ে গেল। পুলিশ এখন

দারুণ ক্ষেপে আছে। আরে বাবা পুলিশকে নিকেস করেছ কি মরেছ। জানি না কেস করতে যাওয়া ঠিক হবে কিনা।

মিসেস ফ্রেঞ্চ অধীর হয়ে উঠলেন।

প্যারি একটা ন্যাকা। সব সময় তালে থাকে। কিন্তু এ কেসটা ভালো হ্যারি। আঁটঘাট বাঁধা, কোন ঝক্কি নেই।

সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে থিওর ময়লা হাতটা এগোতে দেখে হ্যারি ছোঁ মেরে প্যাকেটটা উঠিয়ে নিল।

খেঁকিয়ে বলল, না, তুমি ধান্দা কোর না। যাও কিনে খাও গে।

থিও চাপা গলায় ওকে একটা গালাগাল দিল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ খেঁকিয়ে উঠে বললেন, চুপ কর! কথা বলছি।

হ্যারি নরম হেসে বলল, বল! কি বলছো বল তো?

–ওয়েসলিদের ফার কোট চুরি করতে রাজী আছে?

হ্যারি কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠল। নাক দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল।

–আরে ব্বাপ। দাঁড়াও একমিনিট। তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছো? পাঁচ বছর হাজত ঘোরাতে চাও?

বের্নস্টাইন ক্রুদ্ধ গলায় ফুঁসে বলল, আমিও তাই বলছি।

লোকটা ছোটখাটো, সুটকো। মুখটা বাঁদরের মতো বাদামী কোঁচকানো। হাত আর কবজি গোছ গোছ কালো রুক্ষ লোমে ঢাকা। সার্টের কলারের ওপর দিয়ে ঘাড়ের লোম দেখা যাচ্ছে। ও বলল, একটু বুঝে শুনে বলবে তো? ইটের দেওয়ালে মাথা ঠুকে কোন লাভ আছে? ওয়েসলিদের পশমের পোষাক চুরি! মাথা খারাপ?

মিসেস ফ্রেঞ্চের চোখ কঠিন হয়ে উঠল।

আমরা যদি চুরি করি, ভাগ নেবার বেলায় তখন তো নেবে?

বের্নস্টাইন মাথা হেলাল।

–হ্যাঁ। কিন্তু ওগুলো পাবার কোন চেষ্টাই নেই তোমাদের। মাথাটা ঠাণ্ডা করে ভাবছ না কেন?

হ্যারি বলল, তুমি কি সত্যিই বলছো? আমাদের কিভাবে লড়তে হবে জানো?

জানি। মিসেস ফ্রেঞ্চ সিগারেটের ছাই ফেললেন মেঝেতে। বললেন, কাজটা সহজ নয় তবে করা যেতে পারে।

বের্নস্টাইন ওর লোমশ হাতটা মুঠো করে টেবিলে ঝুঁকে বলল, আমি বলছি, না! চারটে পার্টি চেষ্টা করেছে। তাদের অবস্থাটা কি হয়েছে ভেবে দেখ। একাজে ভয়ানক বিপদের ঝকি আছে।

হ্যারি মুখ গোঁজ করে বলল, ঠিকই বলছে ও। কেসটা হাসিল করতে পারলে একখানা কেসের মতো কেস হবে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমরা পারব কিনা!

মিসেস ফ্রেঞ্চ ক্ষেপে গিয়ে বললেন, তুমি হাঁদার মতো কথা বোল না। তোমরা যা শুনেছ তার বাইরে কিছু জানই না। তোমরা এটা জানকি যে, চারটে হাবা ফার চুরি করতে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ খোঁজ নেয়নি আলমারীটা ভোলার কায়দা কি? ওরা মাথা খাটায়নি কেন না ওদের মগজে ঘিলু বলে পদার্থই নেই।

বের্নস্টাইন সামনে ঝুঁকে বলল, ভুল করছ। ফ্রাঙ্ক খুব খুঁটিয়ে খোঁজ নিয়েছিল। চারমাস ধরে খোঁজ-খবর নিয়েই গিয়েছিল। আলমারী খুলতে যাবার আগেই মামার হাতে ফেঁসে গেল। এবার কি বলবে বল?

অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ওদের থেকে বোঝা যাচ্ছে আলমারীতে এমন একটা ঘণ্টা ফিট করা আছে যে আলমারীতে হাত পড়লেই ওটা বাজতে থাকবে। এই খোঁজটা নেওয়াই আমাদের প্রথম কাজ হবে।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল, কাজটা করা হবে কিভাবে?

মিসেস ওয়েসলির একটি পরিচারিকা দরকার। অন্য সব এজেন্সিতে খবর নিয়ে–টিয়ে আমার কাছে এসেছেন। আমিও এই সুযোগটার জন্যেই বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছি।

এতক্ষণে হ্যারির গলায় আগ্রহ ফুটে উঠল, এই সুযোগে আমরা আমাদের চেনা লোক ফিট করব? মতলবটা ভালই, তাতে কাজ হলেও হতে পারে।

কাজ হবে। ওখানে যদি একটা চালাক চতুর, চৌখস মেয়েকে ঢোকানো যায়, সে সমস্ত খবর, আলমারীর নকশা বের করে আনবে। যদি খবর আনে, তুমি কাজ করবে?

হ্যারি মাথা চুলকে বলল, করতে পারি।

হঠাৎ ওর প্যারির কথা মনে পড়ল। পরশু রাতে ওরা দুজনে বিলিয়ার্ড খেলছিল, প্যারি এখন জেলে। ওয়েসলিদের ফার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে পাঁচবছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে।

একথা মনে হতেই হ্যারি শিউরে উঠল আর বলল, কাজটা সোজানয়, সময় থাকতে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি, থিও কি সঙ্গে থাকছে?

নখ কামড়ানো থামিয়ে থিও বলল, নিশ্চয়, আমি তোমার মত ভীতু নই।

হ্যারি গলার স্বরটা যথাসম্ভব নরম রেখেই বলল, বাঁদরের বাচ্চা, একদিন আমি তোমার ঐ ব্রণগুলো থেতলে দেব। সেই সঙ্গে তোমার মুখটাও থেতো করব।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ওদের কথার মধ্যে বলে উঠলেন, আমরা একটা মেয়ে না পেলে কিছুই করতে পারব না, হ্যারি তোমার সন্ধানে কোন মেয়ের খোঁজ আছে নাকি?

হ্যারি চোখের কোণা দিয়ে তেরছা ভাবে ডানার দিকে তাকাল, আমি তো অনেক মেয়েকেই চিনি, কিন্তু ঠিক কি রকম মেয়ে চাও তার ওপর নির্ভর করছে সব।

মিসেস ফ্রেঞ্চ তড়িঘড়ি বললেন, এই চালাক-চতুর, বয়স কম, দেখতে ভাল, চটপট টাকা পেলে খুশী হবে, এরকম একটা মেয়ে পেলে ভাল হয়। প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট আমি যোগাড় করে দেব।

হ্যারি চেয়ারটা পেছনে হেলিয়ে ওপর দিকে চেয়ে রইল। একটু ভেবে বলল, আছে একটা মেয়ে। বেশ চালাক–চতুর, নাম জুলি হল্যান্ড। ব্রিজ কাফেতে স্যাম হিউয়ার্টের কাছে কাজ করে। সিড তো ওকে দেখেছে। কি সিড, ওকে দিয়ে কাজ চলবে?

বের্নস্টাইন কাঁধ ঝাঁকাল। মুখে বিরক্তির ভাব।

–জানি না। চলতে পারে, তবে ঐ বদমেজাজী, খেকি কুত্তিটাকে মেজাজ সামলে চলতে হবে।

হ্যারি হেসে উঠল।

–সিড রেগে আছে। সেদিনও মেয়েটার পেছনে একটা চিমটি কাটাতে ও অমনি সিডের বদনে একখানা থাপ্পড় কষিয়েছিল।

আরে বাপরে! হাসতে হাসতে আমার বেল্ট ছিঁড়ে যাচ্ছিল আর কি! সিডের কথায় কান দিও না। আমার মনে হয় ওকে দিয়েই চলবে। বেশ ভালই দেখতে, হাঁদা নয়। হিউয়ার্ট ওকে বেশ পছন্দ করে। তবে ওকে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

মিসেস ফ্রেঞ্চ জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশের খাতায় নাম নেই তো?

না না, ও হাঙ্গামা এড়িয়েই চলে, তবে ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, ও বেশ বড় দাও মারার তালে আছে। প্রচুর উচ্চাশা আছে মেয়েটার। ঐ ঘেঁতিয়ে ঘেঁতিয়ে হপ্তায় ক পাউন্ড কামাই করার চেয়ে মোটা টাকা কামানোর ধান্দায় বড় ঝুঁকি নিতেও রাজী হতে পারে।

–ওর কাছে আমরা কিছু ভাঙবনা। তাতে খুব বিপদ। পুলিশ ঠিক আঁচ করবে কাজটা ভেতর থেকে হয়েছে। তাতে ওকে ধরবে। আমাদের এটা নিশ্চিত হতে হবে যে কাজ হাসিল হবার পর, কেস বিগড়ে গেলে ও যেন মুখ না খোলে।

থিও এগিয়ে বসল। ওর মুখে আলো পড়ল।

ও মেয়ে খুঁজে বার করুক। মুখ যাতে না খোলে সে দায়িত্ব আমার।

মিসেস ফ্রেঞ্চ খেঁকিয়ে উঠলেন। মেয়েটাকে আমার চাই। মেয়েটা তোমায় পছন্দ করে হ্যারি?

হ্যারি হাসল।

–ঘেন্না করে বলতে পারব না। তবে একটা কথা কি, জানতে চেয়ো না, কেন মেয়েরা আমাকে দেখলেই গলে পড়ে।

ডানা ওর পায়ে লাথি মারল। হ্যারি তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে চোখ টিপে বলল, এখানে যারা আছে তাদের কথা আমি বলছিনা। তবে এ মেয়েটা আমার দিকে কেমন ভিজে ভিজে চোখে তাকায়। যা বুঝতে হয় বুঝে নাও।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, তাহলে তুমি ওকে ম্যানেজ করে এখন খেলাও। তারপর ওর মন যদি তোমার ওপর পড়ে থাকে তবে ও মুখ খুলবে না।

ডানা রেগে গিয়ে বলল, যেমন তুমি তেমনি তোমার ঐ হতভাগা মেয়েগুলো। সাবালক হও, বুঝলে?

হ্যারি ওর হাতে আদর করে বলল, দিব্যি চলে যাচ্ছে তো? তুমি তো জানো, ওদের কোন মূল্যই নেই আমার কাছে।

থিও বিশ্রীভাবে খেঁকিয়ে বলল, যাও না, দুজনে গিয়ে গলা ধরাধরি করে কাঁদো গে। তোমাদের দেখলে আমার বমি পায়।

হ্যারি রেগে বলল, এক ঘুষিতে এই হোঁদলটাকে আমি ছাতু বানাচ্ছি, দাঁড়াও।

মিসেস ফ্রেঞ্চ রেগেমেগে থিওর দিকে তাকিয়ে হ্যারিকে বললেন, তুমি মেয়েটাকে এক হপ্তার মধ্যে আমার কাছে নিয়ে এসে হ্যারি। ওকে না পেলে আমাদের কিছুই হবে না। পারবে?

দাঁড়াও; এক মিনিট সবুর কর। আমি কাজটা করব বলে কোন কথা দিইনি। আগে শুনি আমার ভাগ্যে কি থাকছে? পড়তায় না পোষালে আমি নেই।

মিসেস ফ্রেঞ্চ এ কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। পেনসিল আর কাগজের প্যাড টেনে। নিলেন তিনি।

ফারগুলো তিরিশ হাজার পাউন্ড ইনসিওর করা। ধর আমরা সতের হাজারই পেলাম?

বের্নস্টাইনের দিকে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন।

আরও বললেন, তোমার ভাগে আট হাজারের কম পড়বে না হ্যারি, বেশীও পড়তে পারে।

–মার দিয়া! এই তো কথার মতো কথা বলেছে, আট হাজার পেলে–। হ্যারি সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

–যতসব পাগলামী!

জানালার শার্সিতে বৃষ্টি ঝাপটাচ্ছে। বর্ষাতি মুড়ে আরামে যে পুলিশটি মে ফেয়ার স্ট্রীট ধরে হাঁটছে, সে জানলেই না যে কয়েক গজ দুরে ডাকাতির একটা পরিকল্পনা হচ্ছে।

ডাকাতিতে ওর কোন আগ্রহই নেই। ও তখন ভাবছিল, সেদিন যে বাঁধাকপির চারাগুলো ও পুতেছে, সেগুলো বৃষ্টি পেলে বেশ বেড়ে উঠবে।

খোঁজ করলে দেখা যাবে কিংস স্ট্রীট, ফুলহ্যাম প্যালেস রোড আর হ্যামারস্মিথ ব্রিজ রোডের ইট, পাথর ও নোংরা জানলার জটিল অরণ্যের ভেতর নানা রকমের কাফে, রেস্টুরেন্ট আর ক্লাব দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে টিকে আছে।

ভাবতে অবাক লাগে এরকম হাড়-হাভাতে চেহারার কাফেগুলো চলে কি করে? হ্যামারস্মিথ ব্রডওয়ে থেকে দোকানদার আর লোকজনদের যে জনস্রোত বেরোয় তাদের কে, কে এসব রেস্টুরেন্টে খেতে আসে?

কিন্তু এই বিশেষ কাফে আর রেস্টুরেন্টগুলো জেগে ওঠে রাতে আর ভোরে। এগুলোতে রাত এগারটার পর ভীড় উপচে পড়ে। একদল ক্রুর ও ভীষণ চেহারার নরনারী চা বা কফি নিয়ে বসে নিচু গলায় কথা বলে। যতবার দরজা খোলে তারা সন্দিগ্ধ চোখে মুখ তোলে, চেনা লোক দেখলে নিশ্চিন্ত হয়।

সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যারা এখানে ইঁদুরের মতো গা ঢাকা দিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যায় তারা এসে ঝট করে এক পেয়ালা কফি খেয়ে চারদিকের হালচাল বুঝে নিয়ে আবার ওয়েস্ট এন্ড পালায়। ছোট-খাট গ্যাংগুলো নতুন চুরির খবরাখবর নিয়ে এখানে আলোচনা করে।

লন্ডনের অপরাধ জগতের সবচেয়ে নোংরা উচ্ছিষ্টরা, ফুলমার্কা সমকামীর দল মুখে রং মেখে, পায়ে চটি, গায়ে রঙিন সোয়েটার পরে এইসব জায়গায় ভিড় করে।

ব্রিজ কাফে এই অঞ্চলের রেস্টুরেন্ট রাজ্যের বাদশা। মালিকের নাম স্যাম হিউয়ার্ট। মোটা লোকটা, মুখের চেহারা চোয়াড়ে বয়স ধরা যায় না।

লন্ডনে বোমা পড়ার সময় হিউয়ার্ট আগ বাড়িয়ে জলের দরে কাফেটা কেনে। ও তখনি জানত ঐ অঞ্চলে মস্তানদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা করার একটা জায়গার দরকার একদিন পড়বেই। সেখানে ওরা কে শহরে আছে, কে নেই, কে দামী সিল্কের মোজা, ফারকোট সবচেয়ে চড়া দামে কিনতে রাজী আছে, সব খবর মস্তানদের জানতে হবে।

ছমাস আগে হিউয়ার্টের অফিসে জুলি হল্যান্ড নামে একটি মেয়ে আসে। কাছাকাছি একটা সস্তার লাইব্রেরীতে কাজ করতে করতে খবর পায় স্যামের ওখানে একটা কাজ খালি আছে।

মেয়েটি ওকে আস্তে বলল, হয়ত আমি কাজে লাগব। কি কাজ করছি তা নিয়ে ঝামেলা পাকাই না।

মেয়েটির ফ্যাকাশে মুখে গাঢ় বাদামী চুল ঢেউ খেলে ছড়িয়ে পড়েছে, দেখে হিউয়ার্টের ভালো লেগেছিল। জুলির সতর্ক দুটো চোখ ছাড়াও স্যামের ভাল লেগেছিল ওর শরীরটি। কামুকের মন দিয়ে ও কল্পনা করে দেখেছিল পোক ছাড়া জুলির শরীর একেবারে মনমাতানো হবে।

কেন যে মেয়েটিকে আগে ও দেখেনি! জুলি যদি লাইব্রেরীতেই কাজ করে তবে স্যামের আগেই দেখা উচিত ছিল।

নিজেকে নিজেই বলেছিল, পাঁচ বছর আগে হলে জুলি স্যামের চোখে পড়তই।

স্যাম যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ মেয়েদের কথাই ভাবে। ভীরু মানুষের মনের অবচেতন মনে যেমন মৃত্যু চিন্তা জেগে ওঠে স্যামের মনেও মেয়েদের কথা তেমনি অমোঘ ভাবেই জেগে ওঠে।

ইদানিং অত বেশী করে মেয়েদের কথা ভাবে না, যখন খেয়াল হয় যে, মেয়েদের কথা তো ভাবছি না? তখন মেয়েদের মুখ মনে ভেসে ওঠে। ও নিজের মনে সক্ষোভে বলে ওঠে, এ আর কিছুই নয়, বয়সের লক্ষণ।

কামনার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিল স্যাম। এ মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াতেই স্যামের মনে কামনা জাগিয়ে তুলল। জুলি একটা সোয়েটার পরেছে, তাতে বুক দুটো ঠেলে উঠেছে। আঁটো স্কার্ট। স্যামের চোখে পড়ার মত জুলির প্রতিটা শরীরের রেখা। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক এমনভাবে লাগিয়েছে যে ঠোঁট দুটো চৌকো মনে হয়। নরম মোমের মতো ঠোঁট দুটো দেখেই স্যামের নিঃশ্বাস আঁটকে গেল।

জুলি স্যামের জরা কবলিত মনে কামনা জাগাবার জন্যেই যে ইচ্ছে করে এই ধরনের পোষাক পরেছে, তা জানলে স্যাম বিরক্ত হতো। এক খোশমেজাজী মস্তান ছোকরা জুলিকে এই কাজের খবরটা দেয়। স্যাম একটা চালাক-চতুর মেয়ে খুঁজছে, যে গাবিয়ে না বেড়িয়ে মুখ এটে থাকবে, তাতেই হবে। মস্তানটি বলেছিল মাঝে-সাজে চটকা চটকিতে জুলির আপত্তি না থাকলে স্যামকে ওর খারাপ লাগবে না।

মস্তানটি বলেছিল, ও বুড়ো হচ্ছে, বুড়োরা কি রকম হয় তা তো জানই। আলুভাতে মার্কা ব্যবহার করে। ও তুমি ঠিক ম্যানেজ করতে পারবে।

জুলি কি জানত না ওই অঞ্চলের কাফেগুলো কি রকম? ব্রিজ কাফেও সেই জাতেরই, তবে হিউয়ার্ট রীতিমত ভাল পয়সা দেবে, সেটাই আসল কথা।

মস্তানটি বলেছিল, হপ্তায় ছ পাউন্ড দেবে, তবে মাঝে মধ্যে যদি ওকে পায়ে চিমটি কাটতে দাও, তবে ওকে → মেরে সাত পাউন্ড পেতে পার হপ্তায়।

সাত–পা–উ–ড! তখনি ও কাজটা বাগাবে বলে ঠিক করে। হিউয়ার্ট যদি ঘিনঘিনে লোক হয় তো কি আর করা যাবে? জুলিরও কিছু এসে যায় না তাতে, ওরকম খামচা খামচি ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। হপ্তায় সাত পাউন্ড! এ যে কুবেরের ধন!

জুলির বয়স বাইশ। ওর মা বাবা অসম্ভব গরীব। এর মধ্যে কুড়িটা বছর কেটেছে দুঃসহ দারিদ্রে। কখনো কুড়িয়ে, বাড়িয়ে, কখনও চুরি করে পেট চলত। জুলির মনে পড়ে ওর পেটের খিদে কখনো যেত না।

অতীতের কথা যত দূর জুলির মনে পড়ে ওর জীবনটা ছিল হতাশায় ভরা, অন্যদিকে ওর মনে হত ও যেন ফাঁদে পড়া জন্তু। মনে হত ওর অনেক টাকা থাকলে ভালো ভালো জিনিষ কিনতে পারত ও, সব কিছু থেকে ও বঞ্চিত হচ্ছে। জীবনের সুখ-আরামের উপকরণ পাবার জন্যে ও তখন মরিয়া হয়ে নিজেই সব যোগাড় করতে লাগল।

প্রথমে বন্ধুর কাছ থেকে চকোলেট, রুটিওয়ালার দোকান থেকে মিষ্টি রুটি, নিজের বোনের মাথার রিবন, পাশের বাড়ির ছেলের কাঠের লাট্টু এইসব ছোট ছোট জিনিষ চুরি করত।

চুরি খুব হুঁশিয়ার হয়েই করত, কেউ ওকে সন্দেহ করত না। পরে লোভ বেড়ে যেতে বারো বছরের জন্মদিন উপলক্ষে ও উলওয়ার্টের দোকানের জড়োয়া গয়নার বিভাগ থেকে চুরি করল এবং ধরা পড়ল।

ম্যাজিস্ট্রেট খুবই দয়া দেখালেন। জুলির পারিবারিক রিপোর্ট পড়ে, ছোটদের মন বুঝে জুলিকে ডেকে পাঠালেন। বেদম ভয় পেয়ে যায় জুলি। ওঁর উপদেশের সারমর্ম বোঝাতে সেই যে বাঁদর আর বোতলের গল্প উনি বলেছিলেন, সেটা জুলির আজও মনে আছে।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, জুলি, তুমি কি জান ব্রেজিলে কেমন করে বাঁদর ধরে?

জুলি বলল, জানে না।

উনি বললেন, আমি বলি তুমি শোন। ব্লেজিলের লোকেরা বোতলে বাদাম পুরে বোতলটা গাছের গায়ে বেঁধে রাখে। বাঁদর হাত ঢুকিয়ে বাদামটা ধরে, কিন্তু বোতলের সরু মুখ দিয়ে বাদামসুদ্ধ থাবাটা বের করতে পারেনা। তুমি হয়তো ভাবছো বাদামটা ছেড়ে দিলেই তো মুঠোটা খুলে হাতটা বের করে পালিয়ে যেতে পারে বাঁদরটা। কিন্তু লোভী বাঁদর তা করে না। এবং ধরা পড়ে। গল্পটা মনে রেখো জুলি। লোভ জিনিষটা সর্বনাশা। বেড়েই চলে এবং একদিন না একদিন ধরা পড়বেই।

ম্যাজিস্ট্রেট ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

আর কোনদিন ও চুরি করেনি।

কিন্তু যতই বড় হতে থাকল ক্রমশঃ ওর টাকাপয়সার ওপর আকর্ষণ বাড়তেই থাকল। ইতিমধ্যে ওর বাবা-মা লন্ডনে বোমা পড়ার সময়ে মারা গেলে ও একখানা খুপরি ফ্ল্যাটে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করল। সহসা ও একদিন আবিষ্কার করল এখন ও যখন ইচ্ছে, যত ইচ্ছে রাতের পর রাত বাইরে কাটাতে পারে। কেননা ওর মধ্যে এখন পুরুষকে আকর্ষণ করার মত কিছু সম্পদ লুকিয়ে আছে।

কিছুদিনের মধ্যেই ও নিজের এই মোহিনী শক্তির কথা জেনে গিয়েছিল। সামান্য অছিলায় পুরুষেরা ওর শরীরে হাত রাখলে ও চটে যেত। বাস কন্ডাক্টর ওকে হাত ধরে নামাতে গেলে ও বিরক্ত হতো। বুড়োরা ওর হাত ধরে রাস্তা পার করে দিতে চাইলে ও খেপে উঠত। অন্ধকার সিনেমা হলে কোন পুরুষ ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পয়সা খোঁজার অছিলায় ওর পায়ে হাত বোলালে ও চটে উঠত।

কিছুদিনের মধ্যে ও এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এখন স্বাধীনতা পাবার পর ও ভাবল এই আকর্ষণটুকুকে পুঁজি করে তুলতে পারা যায় না?

যুদ্ধ আর আমেরিকান সৈন্যদলই ওকে এই সুযোগ এনে দিল। ইস্ট এন্ড থেকে যেসব ছুকরীরা এসে ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে ফুর্তি করে, ও তাদের দলে ভিড়ল।

সৈন্যগুলো পিকাডিলিতে ঘোরাঘুরি করলে ঐ ছুকরিলো হিঃ হিঃ করে হাসে আর ওরা তা উপভোগ করে। সতেরো বছরের জুলি এমন একটা বড় ঘরের মেয়ের মতো আদব কায়দা রপ্ত করল যে ওকে দেখে মনে হত আলাদা জাতের মেয়ে।

অফিসাররাই ওকে পছন্দ করল বেশী। এখন আর ওকে ছোট্ট খুপরি ঘরে দেখাই যায় না। এই ভাবে নিজের চারপাশে একটা কঠিন পাঁচিল গড়ে উঠল। কয়েকটা সম্পত্তি– একটা দৃঢ়কঠিন ব্যক্তিত্ব, এক আলমারীঝলমলে পোষাক, পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করার অভিজ্ঞতা আর পোস্টাফিসে পঞ্চাশ পাউন্ড জমে উঠল।

এইভাবে কিছুদিন ভালই কাটল। কিন্তু যুদ্ধ ফুরোতেই সৈন্যরা দেশে ফিরে গেল। ওর হাতে টান পড়তেই শুরু হল ছল–চাতুরীর খেলা। কাপড়ের কুপন, খাবার, টাকা সব কিছুর জন্যই চাতুরীর আশ্রয় নিতে হলো অবিরাম। ভাগ্য জোরে লাইব্রেরীর কাজটা জুটল মাইনে হপ্তায় দশ শিলিং।

জীবনটা এখন শুধু ছলচাতুরি আর কৌশল হয়ে উঠল। জুলির মনে হল জীবনে বেপরোয়া খুঁকি না নিলে দিন মন্দাই যাবে। ওর মনে হল, সৎপথে থেকে কষ্ট কর, নয় অসৎপথে গিয়ে মজা লোট সামনে এখন দুটো রাস্তা খোলা। মাঝামাঝি সন্তোষজনক কোন পথই নেই।

ও জানত ব্রিজ কাফে জায়গাটা বদমাশদের আড্ডাখানা। কিন্তু ওখানে পয়সা মেলে, মোদ্দা কথা পয়সা। দশ শিলিং–এ হপ্তা চালাতে চালাতে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে।

তরুণ মস্তানটি বলেছিল, হিউয়ার্টের ওখানে কাজ করলে তুমি শহরের ভি. আই. পি-দের দেখতে পাবে, পাশার দান ঠিক ঠিক ফেলতে পারলে জন্মে অভাব হবে না। এত সুন্দর চেহারা তোমার, এটাকে কাজে লাগিয়ে মজা লোট। এই লাইব্রেরীতে কাজ করে নিশ্চয়ই মজা পাও না, তাই না?

হপ্তায় সাত পাউন্ড! ও তখনি মন ঠিক করে ফেলেছিল। কাফেটার প্রচুর বদনাম থাকা সত্ত্বেও ও দিব্যি সামলাতে পারবে। হিউয়ার্ট যদি রাজী থাকে ও এখনি ওর কাছে কাজ করবে।

জুলিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিউয়ার্ট ওকে কাজে বহাল করবে বলে ঠিক করেছিল।

হিউয়ার্ট বলেছিল, দুটো কাজ খালি আছে। একটা দিনের বেলায়, খানিকটা ঝাড়পোছ করা, রাতের জন্য স্যান্ডউইচ বানানো...তেমন খাটাখাটনি নেই আর আহামরি তেমন কোন কাজও নয়। মাইনে হপ্তায় তিন পাউন্ড।

–আর অন্যটা?

জুলি প্রশ্নটা করেছিল বটে, কিন্তু ও তখনই ঠিক করে ফেলেছিল যে দ্বিতীয় কাজটাই ও নেবে।

হিউয়ার্ট চোখ টিপে বলেছিল, অন্য কাজটা তোমার পছন্দ হতে পারে। যে মেয়ের উচ্চাশা আছে যে মেয়ে মুখ বুজে থাকতে জানে তার মনের মত কাজ।

–তাতে কি মিলবে?

–হপ্তায় সাত পাউন্ড। টাকার হিসেব রাখবে, যে যা বলবে, মনে রাখবে। কাজটা রাতে–সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত মুখবন্ধ রাখতে হবে মানে মুখে কুলুপ এঁটে রাখা, বুঝলে।

জুলি বলল, আমি কথা বলি না।

বলে অবশ্য খুব একটা লাভ হবে না। অন্তত এ পাড়ায় তো নয়ই। আমার একটি মেয়ের। কথা মনে আছে, তোমার থেকে বয়সে ছোট হবে, কি একটা কথা শুনে ফেলেছিল, কথাও বলেছিল তা নিয়ে। ওসবে মাথা না দিলেই পারত মেয়েটি। তারপর চোরাগলিতে ওর দেহটা পাওয়া গেল। চেহারা যা তা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং গাবিয়ে বেড়ানোর এই পুরস্কার। বুঝলে?

–আমাকে ভয় দেখিও না। আমি কালকের মেয়ে নই। জুলি ইস্পাতে শাণিত গলায় বলে উঠল।

হিউয়ার্ট ওর দিকে চেয়ে হাসল।

যা বলেছ। যে মুহূর্তে তোমায় দেখেছি তখনই বুঝেছি তোমার মত ধারালো মেয়েই আমার দরকার। এখন শোন, খদ্দেরদের কাজটি করে দিও বুঝলে? খবর রাখা এবং সময় হলে ঝটপট সেটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই এ কাজের একটা দরকারী

অঙ্গ। কোন খবরই লিখে রাখা চলবে না। মনে রাখতে হবে। এক রাতে কুড়িটা খবরও আসতে পারে।

হিউয়ার্ট আরো বলে যেতে লাগল, যেমন ধর, তুমি জ্যাক স্মিথের খোঁজে একটা ফোন পেলে। তোমায় জানতে হবে জ্যাক স্মিথ কে? সে এখানে আছে কি নেই? যদি না থাকে তবে তা জানিয়ে দেবে এবং খবরটা জেনে নেবে। স্মিথ আসার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা যেন তার কাছে পৌঁছে দিতে পারো। আর ও ছাড়া আর কারো কানে না যায়, সে দায়িত্ব তোমার। আর সবসময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে বুঝলে? তবে তুমি পারবে।

জুলিকে ইতস্ততঃকরতে দেখে হিউয়ার্ট বলল, তুমি আগ বাড়িয়ে কোন কিছু জানতেই চাইবে না, যদি কিছুই না জান তো তোমার বিপদের ভয় থাকবে না। তাই না! মুফতে পয়সা কামাবার সহজ রাস্তা এটা। আমি দেখেছি খদ্দেরদের কেউ কেউ খবর পৌঁছে দিলে এক পাউন্ড, নয়তো দু-পাউন্ড দেবে তোমায়। আর শোন তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, আমি তোমায় আট পাউন্ড দেব। এর চেয়ে বেশী আর কি করতে পারি বল? ছেলেরা তোমার মত ফুটফুটে; স্মার্ট, সরেস মাল দেখলে খেপে যাবে। ভেবে দেখ। প্রতি শুক্রবার করকরে নতুন আটটা এক পাউন্ডের নোট তুমি পাবে। ভেবে দেখ, কত জোড়া সিকের মোজা কিনতে পারবে তুমি?

–অ্যাঁ!

জুলি তাড়াহুড়ো করে কাজে লাগবার আগে কাজটার সম্বন্ধে আরো জানতে চেয়েছিল।

হিউয়ার্ট বলেছিল, তুমি ওখানেই ভুল করছ। কিছু জানতে চাইবে না তুমি, ঠিক আমার মত। এ শহরের অন্ধকার পাতালের পুরুষ ও মেয়েরা এখানে এসে কখনো খবর রেখে যায় কখনন বা দু–একটা প্যাকেট। আমি খেতে দিই। একটু–আধটু কাজ করে দিই। কিন্তু আমি কখনো প্রশ্ন করি না। অনেক সময় এখানে টিকটিকিরা আসে। ওরা এটা সেটা খবর জানতে চায় আমি কিছুই জানি না, তাই বলতেও পারিনা। তুমিও কিছু জানবে না, তোমাকেও ওরা জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তুমিও কিছু বলতে পারবে না। একেই বলে বুদ্ধির ধার।

জুলি চমকে উঠে বলেছিল, এখানে পুলিশ আসে? এটা আমার ভাল লাগছে না।

হিউয়ার্ট অধৈর্য হয়ে হাত নেড়েছিল এবং বলেছিল, তুমিও জান, আমিও জানি। পুলিশ সর্বত্র নাক গলিয়ে বেড়ায়। ওদের চাকরীটাই এই। তুমি যেখানেই কাজ কর কিছুই এসে যাবে না, কেন না পুলিশ সেখানে যাবেই। আজ হোক, কাল হোক, যাবেই। তাতে কার কি এসে গেল? আমরা তো লোককে সার্ভিস দেওয়া ছাড়া কোন অন্যায় করছি না।

আমাদের খদ্দেররা যদি ফন্দিবাজি করে তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। তাছাড়া তুমি ভাবছো কি? তোমায় আমি আট পাউন্ড দিচ্ছি। কাজটাতো পঞ্চাশ শিলিং-এর। পঞ্চাশ শিলিং ফললে ডজন ডজন মেয়ে আমি পেতে পারি। কিন্তু আমি আট পাউন্ড দিচ্ছি, কেননা পুলিশ প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য করবেই যে তা বলছি না, তবে করতে পারে। আমি জানি কোন মেয়েই পুলিশের সংস্পর্শে যেতে চায় না। তাই আমি মাইনেটা একটু বেশীই দিচ্ছি।

এসব কথা জুলির বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। বিশেষ করে টাকার অঙ্কটা তো চমৎকার। এ সুযোগ একবার হাতছাড়া করলে, জন্মেও জুলি হয়তো এমন সুযোগ আর পাবে না।

জুলি সবকিছু ভেবেচিন্তে বলেছিল, বেশ। আমি কাজটা নেব।

কাজটা যে কি সহজ, কিছুদিন কাজ করে ও অবাক হয়ে গেল। রাত এগারোটার আগে কাফেয় ভিড় জমে না। তারপর বাঁধা খদ্দেররা আসতে থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া আর কথাবার্তার গুঞ্জনে ঘরটা ভরে ওঠে।

ক্যাশ ডেস্কের সামনে কাঁচ দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় বসে জুলির মনে হয়েছে এ একেবারে প্রথম সিটে বসে থিয়েটার দেখার মতো ব্যাপার। জুলির মনে হয় না এই ঘরটার সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ আছে। ওর নিজেকে মনে হয় যেন অদৃশ্য, কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। অদৃশ্য এক দর্শক গোপন জানলা খুলে একটা অদ্ভুত, উত্তেজক নাটক দেখছে।

দাঁতে চুরুট চেপে ধরে, কড়ে আঙুলে একটা মস্ত ঝলমলে হীরে বসানো আংটি পরে হিউয়ার্ট ওকে প্রথম রাতটা সব বলে কয়ে দিচ্ছিল। ঘরের লোকজনগুলোকে চিনিয়ে দিচ্ছিল। জুলির কানের কাছে মৃদু, একটানা স্বরে বলে যাচ্ছিল, বাদামী রঙের কোট পরে ঐ ব্যাটার নাম সিড বের্নস্টাইন। চিনে রাখ। গিডিয়ন রোডে ওর একটা ফারের দোকান আছে। সভায় ফার কিনতে গেলে সিডের কাছে গিয়ে আমার নাম বললে ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। ওর সঙ্গে যে কথা বলছে ওর ধরন-ধারণ আর ব্যবহার খুব মার্জিত। তাই

সবাই ওকে ডিউক বলে ডাকে। কখনো দেখবে না ও প্লেটে চা ঢেলে খাচ্ছে। ও কি করে জানতে চেয়ো না।

হিউয়ার্ট বলেই চলল, ও হলো পাগসি। ওই যে ছাইরঙা স্যুটপরা লোকটা দেখছে ও রেসের বড়বাবু। কুকুরকে আফিম খাওয়াতে ওর মতো–হিউয়ার্ট তাড়াতাড়ি নিজের জিভকে সামলে নিল, যাকগে, ও পাগসি, এইটুকু মনে রেখে বাকীটা ভুলে যেও। আর ওদিকে যে হতভাগা সিগারেট ধরাচ্ছে ও গোলডস্যাক। ও ব্যাটার মাথাটা বেজায় সাফ। দু বছর আগে যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, পকেটে তিরিশ শিলিংও ছিল না। আর এখন ও দশ হাজার পাউন্ডের চেক কেটে দিতে পারে, ভাতে হাত পড়ে না। ও হচ্ছে বাজী ধরতে ওস্তাদ।

জুলি-বের্নস্টাইন, পাগসি আর অন্যদের চিনে ফেলল। পাগসি আর ডিউক ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একবার, ও কয়েকটা কথা শুনতে পেল।

পাগসি বলছিল, আমি ভাগাভাগিতে নেই। হয় পঁচিশ হাজার নয়তো ফক্কা। তুমি ঠিক পারবে। ভাবছ কেন?

ডিউকের গলায় সংশয়, আমার পক্ষে গেলা কঠিন। কি বললে? সবগুলোই প্লেয়ার্স?

–হ্যাঁ।

ঠিক সেই সময়ে পাগসি জুলিকে দেখে চোখ টিপেছিল।

জুলি মনে মনে ভেবেছিল, পঁচিশ হাজার প্লেয়ার্স সিগারেটে ওদের কি পড়তা থাকবে? পরদিন কাগজে দেখেছিল, হাউন্ডসভিচের একটা গুদাম থেকে পঁচিশ হাজার সিগারেট চুরি হয়ে গেছে। দুয়ে দুয়ে যোগ করতে ওর অসুবিধা হয়নি।

কাফের জীবনে বৈচিত্র্য যত, উত্তেজনাও তত। জুলি সবসময় টেলিফোন নিয়েই ব্যস্ত থাকত। যে সব খবর আসত ও তার কোন মানে বুঝতো না।

–পাগসিকে বল গ্রে-হাউন্ডকে ভাল দেখাচ্ছে। বুঝেছ? গ্রে-হাউন্ডকে ভাল দেখাচ্ছে।

মিঃ গোলডস্মিথকে বল আমায় ফোন করতে। বারোটার সময় বয় ব্লু।

–মিঃ বের্নস্টাইনের জন্যে খবর আছে। বাঁধা সময়, বাঁধা জায়গা। সি. ও. ডি।

এই সাঙ্কেতিক খবরগুলো জুলির গোলমেলে লাগত, অসম্ভব আকর্ষণ বোধ করত ও। এইভাবে খবর পেয়ে পাগসি, বের্নস্টাইন, স্মিথরা পয়সা করছিল।

পুরুষের সঙ্গ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ওর। একা একা সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না। প্রয়োজন এমন একটি পুরুষের যে মিষ্টি কথা বলবে, উপহার কিনে দেবে। যাকে ইচ্ছে হলে জুলি দাক্ষিণ্য দেখাবে।

কাফেতে যে সব পুরুষরা আসে তারা জুলির দিকে মন দেবার ফুরসত্ব পায় না, পয়সা কামাতে তারা এত ব্যস্ত। হিউয়ার্টকে সহজেই গাঁথা যায়, কিন্তু ও বেজায় বুড়ো। প্রথম প্রথম ও জ্বালাত কিন্তু জুলি শিখে নিল ওকে বাগ মানাতে। সারা সন্ধ্যা জুলি ক্যাশ

ডেস্কের খোপে বসে থাকে, হিউয়ার্ট ওকে চটকাঁচটকির সুযোগ পায় না। ঢোকবার বেরোবার সময়টাতেও ও অন্য কর্মীদের সঙ্গে যায় আসে। হিউয়ার্টকে খুশী রাখার জন্যে জুলি ছিটেফোঁটা করুণা বিতরণ করে। আর মস্তানটির কথানুযায়ী হিউয়ার্ট সামান্যতেই খুশী হয়।

জুলি ওর সমবয়সী একটি সঙ্গী চাইছিল, যে শুধু ওর শরীরটাকেই চাইবে না, যার সঙ্গে ওর মনেরও মিল হবে।

ঠিক তিনমাস ঐ কাফেতে কাজ করার পরই একদিন সেখানে উদয় হল হ্যারি গ্লেব। হ্যারির ব্যক্তিত্ব দেখে জুলি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করল। ওর হাসি মাখা প্রাণোচ্ছল চেহারা চোখে পড়ার মত, ওর আত্মবিশ্বাস অপরিসীম, ওর পোষাক চোখ ধাঁধানো। জুলি তো একেবারে মুগ্ধ।

হ্যারির একমাথা গাঢ় বাদামী ঢেউ খেলানো চুল, সরু গোঁফের রেখা, সবুজ গভীর চোখ দুদম কৌতুকে জ্বলজ্বল করছে। যদিও ও কড়া, নীতিজ্ঞানের বালাই নেই, ছেঁদো স্বভাবের। অহঙ্কারী আর স্বার্থপরও বটে, তবু ওকে পছন্দ না করে পারা যায় না।

হ্যারি সবসময়ে হাসিখুশি, ঠাট্টা ওর ঠোঁটের ডগায়। সবসময়ে ও এক পাউন্ড ধার দিতে রাজি, একটা মুদ্রায় টোকা মেরে দশ পাউন্ড বাজি ধরতে পারে। বাজি ফেলে মদ খেতে ও ওস্তাদ। ওয়েস্ট এন্ডের বেশ্যাদের, রংবাজ ছোকরাদের, ধাপ্পাবাজদের সবাইকে ও চেনে আর সবাই ওকে পছন্দ করে। ও লন্ডনের এক চালু মস্তান।

জুলির মনে হল ও যেন একেবারে সিনেমার পর্দা থেকে উঠে এসেছে। কাফেতে আর যাঁরা আসে তাদের সঙ্গে ওর তুলনা করতে গিয়ে মনে হল ট্রেনে ওর পাশে যে মোটা বুড়োটা বসে তার সঙ্গে ক্লার্কসেরলের তুলনা করছে।

তবে জুলি চালাক মেয়ে। ও হ্যারিকে বুঝতেই দিল না যে হ্যারিকে ওর মনে ধরেছে। নিজের আকর্ষণীশক্তির বিষয়ে ওর ভালই ধারণা আছে। ও জানত আজ না হয় কাল হ্যারিই প্রথম আসবে ওর সঙ্গে ভাব করতে।

সে সময়ে হ্যারি কেনস্টাইনের সঙ্গে কি একটা কারবার করত যার জন্যে বাধ্য হয়ে ও ব্রিজ কাফেতে আসত। ব্রিজ কাফে ওর ভাল লাগত না, হিউয়ার্টকেও নয়।

একদিন ক্যাশ ডেস্কের সামনে জুলিকে ওর চট করে চোখে পড়ল। সন্ধ্যায় জুলি ওর কাঁচের খুপরি থেকে বেরিয়ে ডিউককে একটা খবর পৌঁছতে যাচ্ছে, হ্যারি ওর নিটোল চেহারা দেখেই উত্তাপ অনুভব করল। সে প্রথম ওকে সামনাসামনি দেখে একটা লম্বা শিস দিল।

জুলির দিকে বুড়ো আঙুলটা হেলিয়ে ও বের্নস্টাইনকে জিজ্ঞেস করল, বারুদ! স্যাম জোটাল কোথা থেকে?

বের্নস্টাইন বেরিয়ে যাবার পর হ্যারি ক্যাশডেস্কের কাছে গিয়ে জুলির সঙ্গে ফস্টিনষ্টি শুরু করল।

এই সুযোগটার জন্যেই জুলি পরম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ও মনের আগ্রহ হারিকে বুঝতে দিল না বরংহ্যারি ঘনিষ্ঠ হতে গেলে মৃদু ধমক দিল। হ্যারির মুখে ওর খোসামোদ শুনে খুব ঠাণ্ডা ও মোলায়েম ব্যবহার করল।

হ্যারির প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ, চুম্বকের প্রতি লোহার পেরেকের মতো। মেয়েরা ওকে এড়াতে পারে না। জুলির ব্যবহারে হ্যারি রীতিমত অবাক হল। হ্যারির মতে, মেয়েরা প্যানপ্যানে আর ঘ্যানঘ্যানে জীব। কিন্তু এ মেয়েটি যে একেবারে আলাদা প্রকৃতির হ্যারি তা বলে দিতে পারে।

জুলি মেয়েটি এমনিতে বেশ। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দেখে হ্যারির ভেতর পর্যন্ত বিড়বিড় করে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে, ও হ্যারির মতলব ধরে ফেলেছে। হ্যারিকে বিশেষ আমল দিতে রাজী নয়, তা সে যতই তোষামোদ আর মিষ্টি ব্যবহার করুক না কেন।

হ্যারি একজোড়া সিল্কের মোজা, একবাক্স চকোলেট নিয়ে ঘুরে ঘুরেই আসছে জুলির কাছে কথা বলতে। হ্যারিকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার জন্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ দিয়ে জুলি যে দেওয়ালটা তৈরী করেছে, সেটা ভাঙবার জন্যে হ্যারি বন্ধুর জুলিকে ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছে। জুলি রাজী হয়নি। আবার হ্যারি ওকে ছেড়ে চলে যাক সে ঝুঁকিও জুলি নিতে চায়নি। পুরুষদের সম্বন্ধে ওর অনেক অভিজ্ঞতা আছে। ও জানে হ্যারিকে ও যত ঝুলিয়ে রাখবে তত ওর কামনা বেড়ে যাবে আর তারপর যখন জুলি ধরা দেবে তখনো ওর কামনার আগুন সহজে নিভবে না।

.

মিসেস ফ্রেঞ্চ যখন জিজ্ঞেস করল ওদের সাহায্য করবে এমন কোন মেয়ের খবর হ্যারি রাখে কিনা, তখন হ্যারির জুলির কথা মনে এসেছে। ওর মনে হয়েছে জুলি টাকা চায়, জুলির বুদ্ধি আছে। বেপরোয়া সুযোগ এলে ছিনিয়ে নেবার অপেক্ষায় আছে জুলি।

তবে জুলি হ্যারির সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের প্রসঙ্গটা সমানে এড়িয়ে যাচ্ছে। হ্যারি ঠিক করেছে জুলির প্রতিরোধ ভাঙতে হলে ওকে কাজের প্রস্তাবটা দিতে হবে। আর কাজের প্রস্তাবটা দেবার আগে ওর কাফের চাকরীটা চলে গেলে সবচেয়ে ভাল হবে। যতদিন চাকরী থাকবে, বাঁধা মাইনে পাবে ততদিন ও স্বাধীন। আর ওর যদি নীতিজ্ঞান প্রবল হয়, তবে হ্যারির প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

হ্যারি স্বাধীনচেতা মেয়েদের ভয় পায়। জুলি স্বাধীন বলেই ওদের মধ্যে এই আড়াল, হ্যারি সেটা নিশ্চিত।

তাহলে হ্যারির প্রথম কাজই হবে ওর কাফেতে চাকরীটা খাওয়া। কিন্তু কিভাবে! হিউয়ার্টের কাছে তো জুলি ভালই কাজ করছে, ওকে চাকরী থেকে হটিয়ে দেবার মতো কোন কারণই ঘটেনি এ পর্যন্ত। তাহলে কি করা যায়। মাথা ঘামিয়েও ও কিছু বের করতে পারল না।

হ্যারি নিজেকে প্রবোধ দিল, যাক যা হয় একটা উপায় ঠিক হয়ে যাবে। হলও তাই। সবসময়ই হয় তাই-ই। তবে ও যা ভেবেছিল সে ভাবে নয়।

.

মিসেস ফ্রেঞ্চের ওখানে মিটিং হয়ে যাবার দুদিন পরে জুলির টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় একটি মেয়ে বলল, ওখানে কি মিঃ হ্যারি গ্লেব আছেন?

জুলির মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। ও তিন দিন হ্যারিকে দেখেনি, তবে কি ওর সঙ্গে বড্ড রুক্ষ ব্যবহার করে ফেলেছে বলে ও বাধ্য হয়ে অন্য কোন মেয়ের কাছে গেছে?

না আমার মনে হয় উনি কাফেতে নেই, জুলি বলল। মনে মনে ভাবল কে এই মেয়েটি।

–আপনি ঠিক বলছেন? অসম্ভব জরুরী দরকার। আপনি প্লিজ একটু দেখবেন উনি আছেন কিনা। উনি বলেছিলেন ওখানে থাকবেন।

জুলি চমকিত হল। মেয়েটির গলায় হিস্টিরিয়া।

অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হিউয়ার্ট লক্ষ্য করল ঘন তামাকের ধোয়ার ভেতর চোখ বুলিয়ে জুলি চারিদিকে যেন কাকে খুঁজছে।

–কি হয়েছে? হিউয়ার্ট জুলিকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

একটি মেয়ে মিঃ গ্লেবের খোঁজ করছেন। মনে হল মেয়েটি বেজায় উদ্বিগ্ন।

হিউয়ার্ট বাঁকা হাসি হেসে বলল, গ্লেবের বান্ধবীরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়েই থাকে। বোকাগুলোর ওটাই স্বাভাবিক মনের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। হ্যারি এখানে নেই।

জুলি ফোনে মুখ রেখে বলল, দুঃখিত, আমরা ওকে আজ রাতে দেখিনি।

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর মেয়েটি বলল, উনি আসবেন, এলে আমাকে ফোন করতে বলবেন। নম্বরটা নিন দয়া করে।

জুলি নম্বরটা মুখস্থ করে নিল। বলল, হ্যারি আসার সঙ্গে সঙ্গেই খবরটা ও দেবে। তারপর ফোন নামিয়ে রাখল।

হিউয়ার্ট মুখ বেঁকিয়ে গজগজ করতে করতে বলল, ও এখানে না আসুক, এটাই আমি চাই, ওর দ্বারা কারোর কোনদিন ভাল হয়নি।

কয়েক মিনিট পরে কাফেতে হ্যারিকে ঢুকতে দেখে জুলি ওকে হাত নেড়ে ডাকল।

হ্যারি এগিয়ে এসে বলল, হ্যালো! তুমি নিশ্চয় বলছ না, অন্ততঃ একবার তুমি আমায় দেখে খুশী হয়েছ?

কয়েক মিনিট আগে ফোনে একটা খবর এসেছে। একটি মেয়ে জরুরী দরকার বলে ফোন করতে বলেছে। রিভার সাইড ৫৮৮৪৫ নম্বর।

হ্যারির মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে হঠাৎ ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

–ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?

হ্যারিকে ভালো লেগেছে জুলির। এখন ও আর ফাজলামোনা করে গম্ভীর, কঠিন আর ভয়ঙ্কর চিন্তিত হয়ে উঠল। জুলি লক্ষ্য করল হ্যারির ডায়াল ঘোরাতে হাত কাঁপছে।

–ডানা?

জুলি ছাড়া হ্যারির কথা এঘরে কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

–হ্যারি কথা বলছি। কি হয়েছে?

হ্যারি উত্তরটা শুনল। জুলি দেখল হ্যারির হাতটা রিসিভারের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসেছে।

কতক্ষণ আগে? ঠিক আছে। চেপে বসে থাক। ঠিক আছে। চুপ কর, বোক না। সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা চলি।

ও টেলিফোন রেখে দিল।

জুলি ওকে চোখ দিয়ে বিধে বলল, কি কেউ ধরে ফেলেছে তোমায়?

–হ্যাঁ।

হ্যারি ওকে এক লহমা ভাল করে দেখল।

আমায় একটু সাহায্য করতে পারো? ঘাড় ঘুরিয়ে হ্যারি জুলির কোলের ওপর সাদা কাগজে মোড়া একটা ছোট প্যাকেট ফেলে দিয়ে বলল, কাল অবধি এটাকে সামলে রেখ, কেমন? লুকিয়ে রেখ। যদি তোমার কাছে কেউ খোঁজ নিতে আসে আমি তোমায় কিছু দিয়েছি কিনা, তুমি একটা কথাও বলল না। কেমন?

জুলি হেসে বলল, আর কারোর জন্যে এ কাজ করতাম না। তোমার জন্যে করব।

লক্ষ্মী মেয়ে। কাল আমার সঙ্গে একটু বেরোতে পারবে? আমি তোমায় লাঞ্চ খাওয়াবো।

কাল নয়। কাল আমার সময় হবে না। কথাটা আদৌ সত্যি নয়। তারপর একটু থেমে বলল, পরদিন হতে পারে। তুমি কাল রাতে আসবে?

নিশ্চয়ই তুমি ওটা সামলে রেখো। চলি।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল হ্যারি। দরজা খুলতেই আচমকা ও দাঁড়িয়ে পড়ল, এক পা পিছিয়ে এল।

বিশাল চেহারা, গায়ে বর্ষাতি, কপালে টুপি নামানো, দুটি লোক কাফেতে ঢুকল। পুলিশ! এটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে জুলির হাত-পা অবশ হয়ে যেতে লাগল, ওর মনে হল ও তলিয়ে ডুবে যাচ্ছে। ওর আগেই বোঝা উচিত ছিল, এই জন্যেই হ্যারি প্যাকেটটা হাত বদল করল।

হ্যারি পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে সহজ, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে, হাসছে। কাফের অন্যান্য নারী-পুরুষরাও ওদের দেখছে, কেউ নড়ছে না, কথাও বলছে না। নিজেদের যেন রবার দিয়ে মুছে ফেলেছে সবকিছু থেকে, এমনই নৈর্ব্যক্তিক মুখভঙ্গি ওদের।

ডিটেকটিভ ডসনের মুখ চেনে জুলি। সে হিউয়ার্টের অফিসের দিকে ঘাড় হেলাতেই হ্যারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে এদিকে হেঁটে জুলির দিকে না তাকিয়েই চলে গেল।

পুলিশগুলো যেই চোখের আড়াল হল, অমনি যত মেয়ে পুরুষ সবাই হুড়োহুড়ি করে দরজার দিকে ছুটে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কাফেটা খালি হয়ে গেল।

জুলি ঘাবড়ে গিয়ে প্যাকেটটা ব্যাগে ভরতে যাচ্ছিল কিন্তু তা না করে জনশূন্য কাফের দিকে তাকিয়ে নিয়ে স্কার্টটা তুলে কোমরের বাঁধন ঠেলে প্যাকেটটা ঢুকিয়ে নিল। ব্যাগে রাখল না কারণ ওরা প্রথমেই ব্যাগটা খুঁজবে।

হিউয়ার্টের অফিসে বেশীক্ষণ থাকল না পুলিশ। ওরা হ্যারির সঙ্গে বেরিয়ে এল। পেছনে হিউয়ার্ট। ওর মুখে চাপা রাগ।

কমবয়সী অফিসারটি হ্যারিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর একসঙ্গে বেরিয়ে গেল ওরা।

হিউয়ার্ট আর ডসন কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর ওরা জুলির কাছে এল। ডসন টুপিটা তুলে ধরল। ওর বিশ্বাস ভদ্র ব্যবহার করলে প্রতিদান পাওয়া যায়।

ইভিনিং মিস। আপনি কি ঐ গ্নেব ছোকরাকে চেনেন?

জুলি ওদের দিকে উদ্যত দৃষ্টিতে চাইল।

না চিনি না। যদি চিনিও তাতে আপনার কি?

–ও এখনি আপনার সঙ্গে কথা বলছিল না?

সিগারেট কিনছিল।

ডসন ওর দিকে সোজাসুজি চাইল। জুলি চোখ ফিরিয়ে নিল।

কিনছিল বুঝি? কিন্তু আমি যখন ওকে সার্চ করলাম, প্যাকেট দেখলামনা তো? কি ব্যাপার বলুন তো?

জুলির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভুল হয়েছে, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। ও চুপ করে রইল।

আপনাকে ও কিছু রাখতে দেয়নি? ডসন সোজাসুজি প্রশ্ন রাখল।

জুলি বুঝতে পারল ওর মেরুদণ্ড শিরশিরিয়ে একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ উঠে আসছে, কিন্তু ও জোর করে ডসনের চোখে চোখ রেখে বলল, –না দেয়নি।

–আপনার ব্যাগটা দেখতে দেলে?

জুলি জ্বলে ওঠার ভান করে বলল, আমার ব্যাগ দেখার কোন অধিকার নেই আপনার। তবে দেখলে যদি খুশী হন তো দেখুন।

ব্যাগটা ডসনের দিকে ঠেলে দিল। ডসন ওটা দুলো না পর্যন্ত। বলল–ঠিক আছে মিস। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

হিউয়ার্টের দিকে চেয়ে ডসন বলল, চললাম স্যাম। আবার দেখা হবে।

ফাকা কাফেটার দিকে চোখ বুলিয়ে ডসন মৃদু হেসে বলল, তোমার কারবারে বোধহয় লোকসান ঘটালাম। মনে হচ্ছে তোমার খদ্দেররা একটুতেই ঘাবড়ে যায়!

কঠিন চোখে হিউয়ার্ট বলল, আচ্ছা।

ডসন জুলির দিকে টুপিটা তুলে ধরে বলল, –গ্লেবের মতো মেয়েদের তাড়াতাড়ি ফাসাতে পারে, এমন কোন ছেলে আছে বলে আমার জানা নেই। হয়তো অন্য কেউও থাকতে পারে, তবে তাতে আমার সন্দেহ আছে। গুডনাইট।

ও চলে যেতে হিউয়ার্ট জুলির দিকে বিশ্রী চোখে চাইল। কড়া গলায় বলল, –মতলব কি? কি শয়তানী করছ তুমি?

জুলি অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি বলছে?

বন্ধ হলে পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে। বলে হিউয়ার্ট ধড়াস করে দরজা বন্ধ করে অফিসে গিয়ে ঢুকল।

গুদামঘরের ফাটা আয়নাটা দেখে জুলি মাথায় টুপি পরছিল, হিউয়ার্ট ঢুকল। কাফেতে এখন শুধু ওরা দুজন।

হিউয়ার্ট ওর স্বভাবসিদ্ধ ভোমির সঙ্গে বলল, গ্লেব তোমায় কি রাখতে দিয়েছিল?

হিউয়ার্টের রুক্ষ গলা আর ঠাণ্ডা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেখে জুলি হুঁশিয়ার হল।

–খিঁচিয়ে বলল, ডসনকে কি বললাম, তা তো শুনেছে, শোননি? আমায় কিছুই দেয়নি ও।

–ডসনকে যা বলেছে তা শুনেছি ঠিকই।

আরো কাছে এসে হিউয়ার্ট বলল, মিথ্যে কথা যদি বলতে না পারো তো চুপ করে থেক। ডসন ঠিকই বুঝেছে তুমি একটা ধান্দা পাকাতে চাইছ। গ্লেব তোমাকে যে আংটিগুলো দিয়েছে, তা যদি ডসন বুঝতে নাও পারে, তবে তোমাদের মধ্যে যে একটা ব্যাপার চলছে তা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছে।

আংটিগুলো? জুলি টের পেল ওর চামড়ার রং ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

ভয় পেয়ে বলল, আ-আমি জানি না তুমি কি বলছ।

ওর চোখে ভয় দেখে হিউয়ার্ট একটু নরম হলো। ও জুলিকে স্নেহ করে, ফালতু ঝুট ঝামেলা পাকাতে চায়না ওর সঙ্গে। বলল, দেখ বাছা, এতদিন নিজেকে তুমি দিব্যি চালাক চতুর বলেই প্রতিপন্ন করে এসেছ। এখন বোকা হয়ে যাচ্ছ। আমাদের আওতার

বাইরে গ্লেবের কারবার। আমরা ওর কারবার থেকে ফুটো পয়সাটিও পাই না। আমরা ওর জন্যে কিছু করিনা, ও-ও আমাদের জন্যে কিছু করে না, বুঝলে? ঠিক আছে তুমি জানতে না। আমার তোমাকে সমঝে দেওয়া উচিত ছিল। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। ভেব না দোষ দিচ্ছি। গ্লেব বড় বেশী পাখোয়াজ।

–বলছি ও আমায় কিছু দেয়নি।

জুলির বুক ধড়াস ধড়াস করছে। ও যদি স্বীকার করে যে হ্যারির কাছ থেকে চোরাই আংটি নিয়েছে, তবে ও একেবারে হিউয়ার্টের হাতের মুঠোয় চলে যাবে। কি বোকামী আর কাঁচা কাজই না হয়ে গেছে প্যাকেটটা নিয়ে। ওর বোঝা উচিৎ ছিল ওতে চোরাই মাল আছে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল ওর।

হিউয়ার্ট ওকে নজর করল। আর ওর পাতলা ধারালো মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো।

–শোন, আজ সন্ধ্যেবেলা একজন ধনী মহিলা দু-সেকেন্ড, বেশী নয় ঠিক দু সেকেন্ড ওর ড্রেসিং টেবিলে হাজার পাউন্ড দামের তিনটে হীরের আংটি রেখে একটু আড়ালে গিয়েছিলেন। ব্যাস! আংটিগুলো বেমালুম হাওয়া। এই হচ্ছে গ্লেব। ঠিক দু-সেকেন্ডে কাম ফতে! অসম্ভব দ্রুত গতিতে কাজ সারে, আর সবার শোবার ঘর হচ্ছে ওর বিচরণক্ষেত্র। এই হলো ওর লাইন! ডসন আর আমি ওকে খুব ভালই চিনি।

চুরিটা করেই ও সরাসরি এখানে চলে এসেছিল। আমার ধারণা মেয়েটার ফোন এসেছিল ওকে সতর্ক করার জন্যে। আর ও তখনই মাল তোমার কাছে পাচার করে। নিজের নোংরা চামড়া বাঁচাতে ও যাকে তাকে ফাঁসাতে পারে। এখন শোন জুলি, গ্লেব একেবারে

গোখরো সাপ। ওর জন্যে এখানে পুলিস ঢাকায় আমি ওকে পছন্দ করি না। ওর কথা ভাবতে আমি প্রস্তুত নই, এখন আমি আংটিগুলো চাই।

জুলি ওর টুপি আর কোট খুলে নিয়ে সাঁ করে দরজার দিকে এগোল কিন্তু হিউয়ার্ট ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ওর চোখে একটা কুৎসিত দৃষ্টি জ্বলে উঠল।

–এক মিনিট দাঁড়াও জুলি।

–আংটির কথা কিছু জানি না আমি। মিঃ হিউয়ার্ট দয়া করে আমাকে যেতে দিন। আমি বাড়ি যেতে চাই।

এখনো নয়। জুলি, আমি খুব ধৈর্য দেখাচ্ছি, কেন না আমি তোমায় পছন্দ করি। কিন্তু ঐ লোকটার জন্যে তুমি গবেটের মত ব্যবহার করছ। এখানে কি চলে না চলে আমার সব নজরে আছে। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলেছ, নানারকম কায়দা করছ, আমি সব লক্ষ্য করেছি। ওকে গাঁথতে চেষ্টা করেছে, তাই না! খুব সাবধান। গ্লেব মেয়েদের সর্বনাশ ছাড়া কোনদিন ভাল করেনি। ওর মত নেংটি ইঁদুর কেন, তুমি অনেক ছোকরা পাবে। গ্লেব মেয়েমানুষের অভিসন্ধি জানে, আর তাতেই ও মাস্টার।

ওঃ। কোন সাহসে তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলো? সরে দাঁড়াও, পথ ছাড়ো বলছি। জুলি খেপে চেঁচিয়ে উঠল।

হিউয়ার্টের আর ধৈর্য থাকল না। ও বলে উঠল, তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, আংটিগুলো আমাকে না দিয়ে তুমি এখান থেকে নড়তে পারবে না। আমায় যদি জোর করে কেড়ে নিতে বাধ্য কর, তবে আমি তোমায় ছাঁটাই করব।

–তুমি এগুলো পাচ্ছ না। আমি তোমার পচা কাজও চাই না। আমি এরকম কাজ অনেক অনেক পেতে পারি। তোমায় ভয় পাই না। বুড়ো শয়তান কোথাকার।

জুলির ছোট্ট সাদা মুখ কঠিন, ওর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবভঙ্গী, মুঠো পাকানো হাত দেখে হিউয়ার্টের মন প্রশংসায় ভরে উঠল। ও হাসিতে ফেটে পড়ল।

চল জুলি। বোকামি কোর না। তোমার যথেষ্ট হিম্মত আছে। তুমি আর আমি দিব্যি চালিয়ে দিতে পারব। আংটিগুলো দিয়ে দাও, আমি এই ঝুটঝামেলা ভুলতে চাই।

বলছি যে তুমি কি বলছ আমার মাথায় ঢুকছে না। বারবার বলছি আমার কাছে আংটি নেই আর থাকলেও সেগুলো আমি তোমাকে দিচ্ছি না।

জুলি খেঁকিয়ে উঠে ছুট লাগাল। কিন্তু হিউয়ার্ট ওকে ধরে ফেলল। একহাতে ওর কব্জি ধরে, অন্য হাতে জুলির গায়ে হাত বুলিয়ে গেল। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জুলি বলল, আমায় ছেড়ে দাও নইলে আমি পাড়া মাথায় করব বলে দিচ্ছি।

–চেঁচাও না, চেঁচাও। হিউয়ার্ট হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, যদি পুলিস আসে তো বলব গ্লেব তোমায় আংটিগুলো দিয়েছে। তখন তুমিই ফাসবে। বেশী কায়দা কোর না। চুপ করে দাঁড়াও। আমি জানি ওগুলো তোমার কাছেই আছে।

ও আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে প্যাকেটটা কোথায় আছে টের পেল।

–আহঃ! এই তো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। ও রকম করে কোন লাভ হবে না।

জুলি ধস্তাধস্তি করতে লাগল, লাথি ছুঁড়তে লাগল। হিউয়ার্টের গোদা গোদা পায়ে জুতোর ঠোক্কর মেরেও ওর দুটো হাত ছাড়াতে পারল না। এরপর হিউয়ার্ট যখন ওর স্কার্ট টেনে তুলতে শুরু করেছে, জুলি রেগে তীক্ষ্ণ কানফাটা চিৎকার করে উঠল।

দরজা খুলে হ্যারি ঢুকে বলল, আমি তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হচ্ছি স্যাম! যা করছ তা আধাআধি করলে তোমার দু-মাস জেল হতে পারে।

হিউয়ার্ট, হ্যারিকে দেখে ছিটকে জুলিকে ছেড়ে দিল। হ্যারি দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর টুপিটা কায়দা করে হেলিয়ে নামানো, হাত দুটো প্যান্টের পকেটে, দু-চোখে উদ্ধত বিদ্রূপ।

–কেমন করে ঢুকলে? হিউয়ার্টের গলা রীতিমত ক্ষীণ।

হ্যারির চোখের চাউনি আর পকেটে ঢোকানো মুঠো পাকানো হাত দুটো দেখে ও কিসের ভয়ে যেন সিঁটকে গেল।

জুলি টলতে টলতে হোঁচট খেয়ে হিউয়ার্টের কাছ থেকে ছিটকে সরে এলো। ওর চোখ দুটো রাগে জ্বলছে, মুখ সাদা।

–পচা শুয়োর কোথাকার! আমার গায়ে হাত দাও এতবড় আস্পর্ধা।

হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সব তোমার দোষ। এই বুড়োটাকে মেরে টের পাইয়ে দাও কত ধানে কত চাল।

হ্যারি দু-চোখে প্রশংসা নিয়ে জুলির দিকে তাকাল। মেয়েদের চটতে দেখতে, বিশেষ করে জুলিকে ধানীলঙ্কার মতো চিড়বিড় করতে দেখে ও খুব খুশী।

একটু মুচকি হেসে হ্যারি বলল, এই বুড়োটার জন্যে সব রাগ খরচ করে ফেলো না সোনা। তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি একটা বুড়ো লোককে মেরে হাত নোংরা করি। চাও? চল আমার সঙ্গে বাড়ি। কেন, ও তো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

জুলি ঘর ফাটিয়ে চেঁচাল, ওর নোংরা থাবা দিয়ে আমায় চটকাবার উচিৎ শিক্ষা আমি দেবই।

চার পাউন্ড ওজনের মধু ভর্তি একটা বোতল তুলে নিয়ে জুলি হিউয়ার্টের দিকে ছুঁড়ে মারল। ওর বুকের মধ্যিখানে বোতলটা লাগল, হিউয়ার্ট টলতে টলতে পিছু হটে গেল। ও আরেকটা কিছু ছোঁড়ার জন্যে খুঁজছিল কিন্তু হ্যারির হাসির চোটে দম আটকাবার জোগাড় হল। হ্যারি ওকে শক্ত করে ধরে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলো। চেঁচিয়ে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও স্যাম। ওকে আমি বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারব না। ও তোমায় নির্ঘাত খুন করবে।

ধড়াস করে দরজা বন্ধ হলো, চাবি ঘুরল।

জুলি রাগের চোটে হ্যারির হাত ছাড়িয়ে দরজায় আঘাত করতে লাগল।

–আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও, নোংরা বুড়ো ছাগল কোথাকার। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার শেষ হয়নি। তোমায় আমি শেষ করব হতভাগা।

দরজার ফাঁক দিয়ে হিউয়ার্ট চেঁচিয়ে বলল, বেরিয়ে যাও তুমি। তোমায় আমি ছেড়ে দিলাম, বুঝলে! তোমার মুখ পর্যন্ত দেখতে চাই না। ভাগো নইলে, পুলিশ ডাকব।

জুলি পালটা চেঁচাল, আমি তোমাকে ধরাব আমার গায়ে হাত দেবার জন্যে। ভেবনা, পার পাবে তুমি, ভেবো না মোটেই।

জুলি রাগে ভেতরে ঢুকতে দাওশেষ করব হতভাগতম। তোমায় আমি হে

হ্যারি বলল, চল জুলি। যেতে দাও বুড়োটাকে। যথেষ্ট ভয় খাইয়েছে, ও আর কোন ঝামেলা করবে না।

জুলি হিউয়ার্টকে ছেড়ে হ্যারিকে নিয়ে পড়ল।

আমার কাজটা খেলে তুমি। তোমার পক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করাটা সোজা। কিন্তু আমি এখন করবটা কি?

হ্যারি ভাবল, আমি বলেছিলাম যা হয় কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু এতো দেখছি আরো ভাল হলো।

জুলি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলল, তুমি কি ব্যবস্থা করবে শুনি?

জুলি এখন উপলব্ধি করছে যে কাফেতে কাজ না করার মানেটা না খেয়ে মরা। হপ্তায় বারো পাউন্ডের কাজ পাওয়া অসম্ভব। ও হ্যারির ওপর চেঁচিয়ে উঠল, জাহান্নামে যাও তুমি। তোমাকে জীবনে দেখতে না পেলেই ভাল হতো। যদি তোমায় সাহায্য করতে না যেতাম।

মাথা গরম কোর না। চল কথাবার্তা বলে দেখি। আমার গাড়ি বাইরে আছে। আমি তোমায় বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

কি যে করবে, কিছুই বুঝতে না পেরে হ্যারির সঙ্গেই চলল। ও একলা হলে হিউয়ার্টের কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নিত। কিন্তু হ্যারি ওকে কনুইয়ের ধাক্কায় হিউয়ার্টের কাছ থেকে ভাগিয়ে এনেছে। ওকে ফিরে যেতে দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর।

পথের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটা ক্রাইসলার গাড়ি। জুলি দেখল নাম্বার প্লেটের জায়গায় ভাড়াটে গাড়ির নম্বর।

হ্যারি বলল, কোন ভাবনা-চিন্তা না করে সোজা গাড়িতে ওঠো, থাক কোথায়?

–এটা তোমার গাড়ি। জুলি একেবারে বিমূঢ়।

নিশ্চয়ই। নম্বর প্লেটটার কোন মানে নেই। ওর একমাত্র মানে হল আমি গাড়িটা চালু রাখতে পারি, কোত্থেকে পেট্রল পেলে জিজ্ঞেস করে পুলিশ আমায় উত্যক্ত করে না।

গাড়িটা লম্বা, ঝকঝকে বনেট, হেডলাইট ভাল করে দেখল জুলি, মনে মনে ভাবল এমন একখানা গাড়ি রাখতে পারে, তাহলে হয়তো ওর বেশ টাকা-পয়সা আছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই আছে। দেখি ওর ঘাড় ভেঙে আমি কি আদায় করতে পারি।

–স্বপ্ন দেখ না রাজকুমারী! জাগো। কোথায় থাকো তুমি? বলে হ্যারি ওকে ঠেলে গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

ফুলহ্যাম প্যালেস রোড, বলল জুলি, চওড়ানরম গদিতে চেপে বসল আরাম করে। জুলির পাশে হ্যারি উঠে বসল, স্টার্টারে পা রাখল।

–ঘর নিয়ে থাকো? হ্যারির প্রশ্ন।

–ছোট ফ্ল্যাট।

কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করে আছো?

না, তুমি বড় বেশী জানতে চাও, তাই না?

–হ্যাঁ, পরের ব্যাপারে নাক গলানো আমার স্বভাব। একটু হাসল হ্যারি। জনশূন্য পথ দিয়ে ঝড়ের গতিতে গাড়ি চলল। যতক্ষণ না জুলির বাড়ির গেটে গিয়ে গাড়িটা থামল ওরা আর একটি কথাও বলল না।

তারপর হ্যারি জিজ্ঞেস করল, এই বাড়ি? চল ভেতরে যাই। এক কাপ চা পেলে ভাল হতো।

জুলি খ্যাক করে বলল, তুমি ভেতরে আসবে না, কোনো চা-টা পাবে না। যদি আংটিগুলো ফেরৎ চাও তোমাকে রীতিমত দাম দিতে হবে।

হ্যারি ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে চাইল। ওর ঠোঁটের হাসি কিন্তু ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল।

–কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলতে পারবো : না। লক্ষ্মী মেয়ে শোন, আমাকে ভেতরে যেতে বলল।

–এত রাতে পুরুষ মানুষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে ঢোকানো আমার অভ্যেস নেই। আংটিগুলোর জন্যে আমার পঞ্চাশ পাউন্ড চাই, নইলে ওগুলো তুমি পাচ্ছে না।

হ্যারি চাপা শিস দিল।

–অত নিষ্ঠুর হয়ো না সোনামনি। পঞ্চাশ পাউন্ড! ঐ নচ্ছার জিনিসগুলোর আসল দামই অতো নাকি?

–ওগুলোর দাম দশ হাজার পাউন্ড, তা তুমি ভাল করেই জানো। কাল সকালে টাকা নিয়ে আসলে ভাল। নইলে আমি আংটি বেচে দেব।

গাড়ির দরজা হ্যাঁচকা টানে খুলে নেমে জুলি প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে গিয়ে দরজা খুলল বাড়ির।

জুলি!

–কাল সকাল পর্যন্ত দেখব। তার মধ্যে এলে ভাল। নইলে তারপর তুমি ওগুলোর দেখা পাচ্ছে না। সগর্বে ঘোষণা করে জুলি দুম করে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

.

হ্যারি কাছেই অপেক্ষা করছিল। একতলার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ও একটু হেসে গাড়ি চালিয়ে কাছাকাছি গেল। এ পাড়ায় কাছেই একটা গ্যারেজ সারারাত খোলা থাকে। ও সেখানে গাড়িটা রেখে জুলির বাড়ি অবধি হেঁটে এলো। তখন রাত তিনটে বেজে গেছে। ও রাস্তার এদিক-ওদিক দেখে নিল। একটা বেড়াল চোখে পড়ল শুধু। তারপর সহজ অভ্যস্থতায় লোহার রেলিং টপকে পাইপ বেয়ে জুলির জানলা ঠেলে ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে দিল। অসম্ভব দ্রুত ওর চলাফেরা তেমনি নিঃশব্দে। সবশুদ্ধ কয়েক সেকেন্ডও লাগল না।

পর্দা সরিয়ে দেখল ঘরটা বড়, আসবাব মলিন, তেমন আরামদায়ক নয়। বিছানার পাশে টেবিলল্যাম্প। দেওয়াল ঢাকা কাগজ আর আসবাবের নিষ্প্রভ চেহারার ওপর বাড়িটার গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘরটার ওপাশে আধখোলা দরজার ও প্রান্ত থেকে জল পড়ার শব্দ শুনে বুঝল ওটা স্নানের ঘর। জুলি শোবার জন্যে তৈরি হতে হতে গুণগুণ করে গান করছে। টুপি আর কোট খুলে একটা ইজিচেয়ারে বসে হ্যারি সিগারেট ধরাল।

কয়েক মিনিট বাদে সবুজ রাতের পোষাক পরে জুলি ঘরে ঢুকল। শরীরের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। হ্যারিকে বসে থাকতে দেখে ও প্রথমে থমকে দাঁড়াল। তারপর ওর মুখ সাদা থেকে লাল হয়ে গেল।

হ্যারি হালকাভাবে বলল, এই যে, আমায় মনে পড়ছে? বস, এই বিছানার ওপর। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বিপন্ন চোখে জুলি চার দিকে চাইতে চাইতে ড্রেসিং টেবিলে ওর চোখ আটকে গেল। ও ছুটে গেল সেদিকে, কিন্তু তার আগেই হ্যারি সেখানে গিয়ে ওর ব্যাগের নিচ থেকে দুটো হীরের আংটি তুলে নিল।

রেখে দাও, জুলি ক্রুদ্ধ চাপা গলায় বলল।

হ্যারি ওগুলো পকেটে পুরে নরম গলায় বলল, দুঃখিত সোনা। ওগুলো ছেলেখেলার জিনিষ নয়, ভয়ানক দরকারী জিনিষ। আমি কথা বলতে চাই জুলি। এসো, ভাব করি। আমায় এক কাপ চা খাওয়াও।

শয়তান? জুলি রাগে ফেটে পড়ল। বলল, আমি তোমার জন্যে এত হ্যাপা পোয়ালাম আর আমাকেই এক পয়সা দিতে চাচ্ছ না? পচা বদমাশ!

–কে বলল আমি তোমায় কিছু দিচ্ছি না? তুমি কাজ চাও, তাই না? বেশ আমি তোমার জন্যে একখানা দারুণ কাজ দেখে রেখেছি। সত্যি বলছি। ধাপ্পা নয়।

–কি রকম কাজ?

–আগে আমায় একটু চা খাওয়াও। মুখ থেকে বিরক্তি মুছে ফেল। বিশ্বাস কর জুলি, আমি চা না খেয়ে কথা বলতে পারছি না।

জুলি নরম হলো ওর কথা শুনে। বলল, তোমায় নিয়ে পারা যায় না হ্যারি। চা করিয়েই তবে ছাড়বে। দেরী হবে না বেশি।

জুলি চা করতে লাগল আর হ্যারি সিগারেটটা শেষ করে ভাবতে লাগল, আমি ওকে চমৎকার ম্যানেজ করেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি যা বলব ও তাই করবে।

জুলি ট্রে করে চা নিয়ে এল। টেবিলে ট্রে রেখে চা ঢেলে হ্যারিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বলল, কাজের কথা কি বলছিলে? তুমি আমায় পঞ্চাশ পাউন্ড দেবে, ওটা ভুলে যেও না।

স্যাম তোমায় কি দিচ্ছিল?

–হপ্তায় বারো পাউন্ড।

–চট করে তুমি অত টাকার কাজ পাচ্ছো না যদি না–হ্যারি একটু ভেবে নিয়ে বলল, কি কাজ করছ তা নিয়ে বেশী খুঁতখুঁত কর আর...খানিকটা ঝুঁকি নিতে রাজী থাক।

–তোমার এ কথার মানে?

যা বললাম! স্যামের কাছে কদ্দিন ছিলে? ছমাস।

–তার আগে?

–একটা সস্তার লাইব্রেরীতে।

তার আগে?

তার আগে আমি একটা কারখানায় কাজ করতাম। বলতে বলতে জুলির ভুরু কুঁচকে গেল।

–তাহলে পয়সার মুখ দেখেছো সবে এই ছমাস?

–হ্যাঁ। পয়সার মুখ, আমার যদি সাধ্যি থাকে, আমি দেখেই চলতে চাই। জুলি আরও কঠিন গলায় বলল, এর আগে আমি জীবনটা উপভোগ করতেই পারিনি। তোমার কী মনে হয় তুমি আমায় একটা ভালো কাজ দেখে দিতে পারবে?

আমি জানি, পারব।

কি কাজ?

হ্যারি চা খেতে খেতে জুলিকে ভাল করে দেখতে লাগল। আর ওকে নীরব থাকতে দেখে জুলি বলল, তুমি আমার জন্যে কাজ ঠিক করেছ বলে আমি বিশ্বাসই করি না। গুল

দেবার আর জায়গা পাওনি। যদি দাও, পস্তাবে। আমি ডসনের সঙ্গে দেখা করে আংটিগুলোর কথা বলে দিতে পারি। কেউ আমার মুখ বন্ধ রাখতে পারবে না।

হ্যারির হাত থেকে পেয়ালাটা পড়ে যাবার যোগাড় হল। জুলি কথাগুলো ঠাট্টা করে বললেও ঠিক ঠাট্টা হিসেবে নেওয়া যাচ্ছে না। জুলি হয়তো ওকে ভড়কে দিচ্ছে, কিন্তু হ্যারির মনে হল, না, জুলি ভেবেচিন্তেই বলেছে।

এক মিনিট জুলি! কি বলছ ভেবে দেখ। সাবধান, পুলিশকে যে মেয়ে কথা লাগায় তাকে একটা বিচ্ছিরি, কুৎসিত নামে ডাকা হয়, বুঝলে?

কথার ঘায়ে আমি মূর্চ্ছা যাব না। জুলি পালটা জবাব দিল। মাথা ঝাঁকাল, কাজের কথা কি বলছো?

হ্যারি হুঁশিয়ার হয়ে, নিজেকে সামলে বলতে লাগল, এক মহিলার পরিচারিকার কাজ, মোটা টাকার কাজ। আমার এক বান্ধবী বাড়ির কাজের লোকজন দেবার এজেন্সী চালান একটা। তিনি তোমায় কাজটা পাইয়ে দিতে পারেন।

জুলি শক্ত আর আড়ষ্ট হয়ে গেল। হ্যারির দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলতে চাও কি? আমি বাড়ির ঝিয়ের কাজ করব?

না জুলি। শোন, রেগে যেও না। চাট ছোঁড়ার জন্যে মুখিয়েই আছ তুমি। টাকাটা যদি মোটা হয়, তাহলে কি কাজ না কাজ ও সব নিয়ে ভাবছ কেন? বাড়ির কাজে দোষ কি? হাজার হলেও তুমি তো কাফেতে কাজ করেছে। অত পিটপিটিনি তোমার নেই। আছে?

কাজটা খুব ভাল। চমৎকার ফ্ল্যাটে থাকবে, ভাল খাবে, ছুটি পাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা মোটা টাকা পাবে।

বাড়ির ঝি..., জুলি উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল। হ্যারি ওর রাতের পোষাক পরা শরীরটা দেখতে দেখতে টের পেল ওর মন যেন ক্রমশই কাজের প্রসঙ্গ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

–না, আমি পারবনা। হিউয়ার্ট আমাকে হপ্তায় বারো পাউন্ড দিত। তার কমে আমি চালাতে পারব না, চলবে না। বাড়ির ঝি-এর মাইনে তার ধারে কাছেও নয়, ওরা বেশী পায় না।

হ্যারি মুচকি হেসে বলল, এ বাড়ির কাজে পায়। এ কাজটা স্পেশাল কাজ। হপ্তায় পনেরো পাউন্ড মাইনে, কাজ ফুরোলে পঞ্চাশ পাউন্ড বোনাস। কি বল, ভালো নয়!

জুলি পায়চারি করতে করতে ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু কেউ তা দেবে না।

–ঠিক আছে শোন, খোঁচাখুঁচি করে এর বেশী কিছু জানতে চেওনা। হ্যারির গলা ধারালো হয়ে উঠল, আমি চাই ফোকটে কিছু পয়সা কর। কি করে তা জানতে চেও না। যা বললাম আশা করি বোঝার মত বুদ্ধি তোমার আছে।

–তাই বল। নিমেষে জুলির সন্দেহ হল, বলল কোনো জোচ্চুরি কারবার, তাই বলল।

বলতে পারো...তবে তুমি যদি না জান ব্যাপারটা কি, তাহলে তোমার কোন বিপদ নেই। বুঝলে?

জুলি ভাবল, সেই পুরনো যুক্তি। হ্যারি অবশ্য ঠিকই বলছে। হিউয়ার্টও এই একই যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, কিছু দেখ না, কিছু শুনো না, তাহলে তোমার কোন বিপদের ভয় নেই, দিব্যি চালিয়ে নেবে। এই নিয়ম মেনে তা চালিয়ে নিয়েছিলও বটে।

হ্যারি বলল, তোমায় শুধু একটি বিশেষ বাড়িতে মাসখানেক কাজ করতে হবে। ওখানে হপ্তায় তিন পাউন্ড পাবে। আমি দেখব যাতে তুমি আরো বারো পাউন্ড পাও। কাজটা হয়ে গেলে পঞ্চাশ পাউন্ড বোনাস পাবে। কথা পাকা করবার জন্যে এখনি আমি তোমায় দশ পাউন্ড দিতে পারি।

কিন্তু হ্যারি...আমি একটু ভেবে দেখতে চাই।

–ঠিক আছে কালই বোল। এখন চেপে যাও। হপ্তায় পনের পাউন্ড, কাজ ফুরোলে পঞ্চাশ পাউন্ড বোনাস, একেবারে ফুঃ করে উড়িয়ে দেবার মত নয় কথাটা।

জুলির মনে হঠাৎ একটা কেমন সন্দেহ জেগে উঠল, বলল, তুমি ঠাট্টা করছে না তো? তারপর দেখব তুমি এখান থেকে হাঁটা দিলে আর আমি গাড্ডায় পড়ে রইলাম। আমি কালকের মেয়ে নই। তোমার সঙ্গে আমার যদি আর দেখা না হয়, তাহলে আমার কি হবে?

হ্যারি চেয়ার ছেড়ে বিছানায় ওর পাশে এসে বসল। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, কানে কানে একটা কথা শোন। ও জুলির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, আজ রাতে আমি তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি না, বুঝলে?

জুলি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

না, না, ওসবের মধ্যে আমি নেই। না বেরোও তুমি। বরঞ্চ পরে দেখা হবে সেই ভাল।

হ্যারি হো হো করে হেসে উঠল।

নিজের মন জান না, তাই না? প্রথমে আমায় থাকতে বলছ, তারপর তাড়িয়ে দিচ্ছো। আচ্ছা তোমার মন আমিই ঠিক করে দিচ্ছি।

জুলি তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউনটা টানতে গেল, কিন্তু হ্যারি ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। জুলি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ফিসফিসিয়ে বলল, না! থাম হ্যারি, না...।

হ্যারির ঠোঁট জুলির ঠোঁটের ওপর নেমে এল। এক মুহূর্ত ধস্তাধস্তি হল, তারপর দু-হাতে হ্যারির গলা জড়িয়ে ধরল।

জাহান্নামে যাও! জুলি ওর কানে কানে বলল, আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধর আমাকে।

.

জীর্ণ পর্দার ফাঁক দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। পথে একজন গোয়ালা তার ঘোড়াকে কানফাটানো আওয়াজে বেজায় ধমকে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর দুধের বোতলের ঝঝনানি আওয়াজ। আরেকটু দুরে ডাকপিওন কারো বাড়িতে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

জুলি একটু নড়চড়ে শরীর টানটান করে হাই তুলে খেয়াল করল বাথরুমের দিক থেকে জল পড়ার শব্দ আসছে। চাদরের তলায় পা দুটোকে ছড়িয়ে দিয়ে জুলি পরম তৃপ্তিতে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ঘুম ঘুম জড়ানো গলায় জুলি বলল, সব পেয়েছে তো হ্যারি?

–আমি এখনি চা চাই। বিছানা ছেড়ে ওঠনি এখনো?

–এই উঠছি। জুলি আবার পাশ ফিরে শুয়ে চিবুক অবধি চাদরটা টেনে নিল।

–বটে! হ্যারি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। জুলির মনে হল তোয়ালে জড়িয়ে ওকে মুষ্ঠিযোদ্ধার মত লাগছে। রোদেপোড়া পেশল, কঠিন শরীর ওর। হ্যারি বলল, ওঠো শিগগীর, নইলে বিছানা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জুলি বলল, এই উঠছি, উঠছি। এখনো নটা বাজেনি।

হ্যারি বাথরুমে ঢুকে গেল, বলল, সকালে আমার অনেক কাজ আছে।

রান্নাঘরে ঢুকে জুলি কেটলি বসাল। মনে মনে ভাবল, অবাক কাণ্ড বটে! মনে হচ্ছে ও যেন আমার সঙ্গে সারাজীবন রয়েছে। ও যেন আমার জীবনের একটা অংশ। দোষ শুধু নিজের কথা উঠলে এড়িয়ে যায়। এমনটি না হলেই ভাল হত।

রাতে ও গল্প করতে করতে কতভাবে জানতে চেষ্টা করেছে হ্যারির দৈনন্দিন জীবনটা কেমন, ও কি করে, ও কি ভাবে, কিন্তু প্রতিবারই ঠাট্টা তামাশার দেওয়ালে ঠোক্কর খেতে হয়েছে ওকে। প্রতিটা সিরিয়াস কথাকেই তামাশা করে কথার প্রসঙ্গ বদলাতে চেয়েছে।

জুলির চা নিয়ে আসার আগেই হ্যারির পোষাক পরা হয়ে গেছে।

–হ্যারি...ঐ আংটিগুলো...আমার চিন্তা হচ্ছে। তুমি ওরকম একটা কাজ করে পার পাবে না বেশীদিন। জেনে রেখো।

ওর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হ্যারি শুধু হেসেছে।

–দোহাই তোমার, আমার জন্যে ভাবতে শুরু কর না। যদি চিন্তা করতেই হয়, নিজেকে নিয়ে চিন্তা কর।

কিন্তু আমি তোমায় নিয়ে চিন্তা করি যে?

দেখ, এ দুনিয়ায় আমার মেয়াদ অল্পদিনের, ভাগ্যে থাকলে বড়জোর চল্লিশ বছর। চল্লিশটা বছর আবার সময় নাকি? কিসসু না। তারপর কবরের অন্ধকার, ঠাণ্ডা পোকার খাবার হওয়া। তার চেয়ে যদ্দিন জীবন আছে স্ফুর্তি করে নিই।

দশ বছর যদি জেলেই কাটাতে হয়, তবে পয়সা নিয়ে লাভটা কি? আসলে হ্যারি আর জুলি দুজনের জীবনদর্শনই এক রকম। তাই হ্যারির থেকে একটা সন্তোষজনক উত্তর পাবার আশায় জুলি এই প্রশ্নটা করল।

চালাক হতেও জানতে হয়। তিনবছর আমি জেল এড়িয়ে চলেছি, এখনও চলব।

জুলি আবার ওকে খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দিল, আমি না থাকলে তুমি ইতিমধ্যে জেলে ঢুকে যেতে।

–বিশ্বাস, ইচ্ছে হলে কোর। কেউ না কেউ আমার ঠিক জুটে যায়। শুনলে অবাক হয়ে যাবে, তুমি আংটিগুলো না রাখলে আমি যেমন করে হোক ওগুলো পাচার করতামই। এরকম আগেও অনেকবার হয়েছে।

জুলি একটু বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হল। ও ভাবতে চাইছিল যে, নিজেকে ও রীতিমত বিপদগ্রস্ত করে হ্যারিকে জেলের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। খচ্ করে জিজ্ঞেস করল, যে মেয়ে তোমায় সাহায্য করে, তার সঙ্গে সবসময়েই প্রেম কর না কি তুমি? হয়ত তোমার ধারণায় এটাই পুরস্কার?

হ্যারি হেসে বলল, ভারি রগুড়ে মেয়ে তুমি। কার সঙ্গে প্রেম করছি, সে বিষয়ে আমার খুতখুঁতুনি আছে। টের পাবে একদিন।

জুলি এখন হ্যারিকে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে পেয়েছে, তেমনি করে অন্য কোন মেয়েও পেয়েছে, এই চিন্তাটা ওকে যন্ত্রণা দিতে থাকল।

জুলি এটা জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলো না। বললো, হ্যারি...ডানা মেয়েটা কে? তোমায় ফোন করেছিল?

হ্যারির তড়িঘড়ি জবাব, আমার মা। ভারী ভাল, কি যেন কথাটা, মরা হাতি লাখ টাকা, না কি যেন? যা হোক, তোমার ওকে খুব ভাল লাগবে।

জুলি পা ঠুকে বলল, তোমার এসব ন্যাকা ঢং ছাড়ো। বলল, কে ডানা! আমি জানতে চাই। হ্যারি জুলির মুখ লক্ষ্য করল, তারপর হাসল।

–খুঁচিও না জুলি। ডানা আমার পরিচিত একটা মেয়ে। মাথা খারাপ করার মতো কিছু নেই। তোমার অর্ধেক রূপও ওর নেই। আর আমার কাছে ওর কোন মূল্যও নেই।

–ও কেমন করে জানল, পুলিশ তোমায় খুঁজছে? জুলি প্রশ্ন করল।

–মন্ত্র জানে। নখদর্পণে ডসনকে দেখেছিল।

–ভাড়ামি থামাবে? আমাকে সত্যি কথা বলবে কিনা? জুলি রেগে গেল।

–দেখ, নিজের চরকায় তেল দিয়ে যাও। হ্যারি হাসল, কিন্তু জুলি লক্ষ্য করল ওর চোখের দৃষ্টি অতর্কিতে কঠিন হয়ে উঠেছে।

দুজনে দুজনের চোখে চোখে চেয়ে রইল। জুলির চোখই আগে নেমে এলো। ও দেখল হ্যারিকে পীড়াপীড়ি করাই বৃথা। ও এবার চাল পালটালো।

জুলি হেসে বলল, কেশ, রহস্য করতে চাও তো কর। জুলির গলার সব কৌতূহল যেন এক মুহূর্তে নিভে গেছে। বলল, আরেকটু চা নেবে?

হ্যারি পেয়ালা এগিয়ে দিল। আর একটা সিগারেট ধরাল, ঘড়ি দেখে বলল, আর এক মুহূর্তে আমাকে বেরোতে হবে।

জুলি ভাবতে থাকল এই মুহূর্তে হ্যারি ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, আর হয়ত কোনদিনও দেখা হবে না।

চা ঢালতে ঢালতে জুলি জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাক তুমি হ্যারি?

দশনম্বর ডাউনিং স্ট্রীট। ওপরে একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে দিব্যি আরামে থাকি। একটাই বাটলার আমার আর প্রধানমন্ত্রীর কাজ করে।

উদ্বেগে, ক্রোধে জুলি অস্থির হয়ে উঠল। ও ভাবলো একে ঘাঁটিয়ে কোন লাভ নেই। হ্যারির এই ফাজলামি ফচকেমির আড়ালের ব্যক্তিত্বটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। জুলিকে ওরকম নেই আঁকড়ে হলে চলবে না। যখন দুজনে দুজনকে ভালভাবে চিনবে তখন হয়ত হ্যারি ওকে বিশ্বাস করবে।

জুলি হালকা গলায় বলল, তুমি গম্ভীর হতে পারো না হ্যারি?

–গম্ভীর হতে যাবো কেন? খাও, পিও, মৌজ করো, প্রেম করো। আগামীকালই হয়ত কবরের পোকারা তোমায় কুরে কুরে খাবে। গম্ভীর হওয়ার সময় আমার নেই। স্ফুর্তি করতেই চব্বিশ ঘণ্টা লেগে যায়।

–তবে আমি জানতেও পারবো না তুমি কোথায় থাকো? জুলি ভাবল মেয়েটা ওর সঙ্গে থাকে, তাই হ্যারি আমায় ঠিকানা বলছে না।

–একেক সময় তোমার বুদ্ধিতে ধার খোলে জুলি।

–বেশ, রহস্যই করো। জুলি রেগে মুখ ফেরালো।

উত্তরে হ্যারি বলল, আমার বিষয়ে যত কম জানবে ততই মঙ্গল।

কোটটা তুলে নিয়ে ও বলল, আচ্ছা, আমি চলি। কাজের কথা কি ভাবলে জুলি?

জুলি অনিচ্ছুক গলায় বলল, ঠিক আছে। ভাবলাম কাজটা করব। আমায় শুধু পরিচারিকার কাজ করতে হবে, আর কিছু নয়।

হ্যারি বলল, শুধু তাই। তবে চোখ, কান খোলা রাখতে হবে।

জুলি তখনি বুঝল একটা চুরি হবে। ওকে বাড়ির খবরাখবরের জন্যে রাখা হবে। ও এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল। ওকে ইতস্ততঃ করতে দেখে হ্যারি পকেট থেকে পাঁচ পাউন্ডের নোট বার করল। বলল, আমি কথা দিয়েছিলাম আগাম কিছু দেব। নাও, পকেটে রাখো।

আর ইতস্ততঃ করল না জুলি। যে বিষয়ে ও জানে না কিছু, তা নিয়ে বিপদে পড়তে পারে না। আর নিজেকে যথেষ্ট সামলে চলতেও পারে ও। টাকা নিল ও।

আমায় কি করতে হবে?

হ্যারি ওকে একটা কার্ড দিল। বলল, এই ঠিকানায় মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে আমার নাম করে বলবে আমি পাঠিয়েছি। তিনি সব জানেন। উনি সব তোমাকে বুঝিয়ে বলে দেবেন, কি করতে হবে। ও. কে?

–কোন ভয় নেই তো? আমার কোন বিপদ হবে না তো?

–কিসসু না। হ্যারি বলল, তোমায় শুধু পরিচারিকার কাজ করতে হবে। ব্যস। সোজা তাই না?

ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জুলি বলল, আর চোখ কান খোলা রাখতে হবে।

হ্যারি হাসল, যা বলেছো। আচ্ছা, জুলি, আবার দেখা হবে।

–আবার কবে দেখা হবে?

–শিগগীর। এখন আমার অনেক কাজ আছে। পরে আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

–পুরুষ-মানুষের মতোই কথা। যা চাইলে পেয়ে গেলে, ব্যস্, ঠাণ্ডা মেরে গেলে! জুলিকে কাছে টেনে নিয়ে হ্যারি চুমো খেল।

–যদি আমাকে খুব দরকার হয়, মিসেস ফ্রেঞ্চকে একটা খবর দিও। দু-একদিন বাইরে যেতে পারি, উনি জানেন কোথায় খোঁজ করলে আমায় পাবেন। ঠিক আছে?

ওর দিকে চেয়ে জুলি বলল, ঠিক তত থাকতেই হবে।

ওকে আবার জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে হ্যারি বাইরে বেরিয়ে গেল।

জানালায় দাঁড়িয়ে জুলি ভাবল, চুরির ছক কষা হচ্ছে। আমাকে ভেতরের খবর জোগাড় করে দিতে হবে। যাকগে, টাকাটা ভালো। আসল চুরির সঙ্গে তো আমার কোন যোগ নেই, তাহলে আমার বিপদ হতে পারে না।

হাতের নোট দুটোর দিকে চেয়ে ও হাসল, টাকাটা জব্বর।

দুষ্প্রাপ্য বইয়ের দোকান

মে ফেয়ার স্ট্রীটের একটা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের দোকানের ওপরে জুলি মিসেস ফ্রেঞ্চের অফিস খুঁজে পেল। বইয়ের দোকানের ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে সিঁড়ি।

একটি মেয়ে পিকনিজ কুকুর কোলে নিয়ে দরজায় শড়িয়েছিল। জুলির দিকে চাইল সে, কিন্তু কোন কৌতূহল ফুটে উঠল না তার চোখে। তারপর গাঢ় রঙ মাখা চোখ দুটো রাস্তার দিকে ফেরাল। একটি লোক প্রথমে মেয়েটিকে তারপর জুলির দিকে চেয়ে হেঁটে চলে গেল। মেয়েটি ভ্রূক্ষেপও করল না। এর মধ্যে লোকটি এখান দিয়ে দুবার হেঁটে গিয়েছে। যারা মনস্থির করতে সময় নেয়, এ হয়তো সেই ধরনের লোক। ও আবার ফিরে আসবে।

জুলি লবিতে ঢুকল। মেয়েটা নাক সিঁটকাল। আমি কোনদিন অত নিচে নামব না। জুলি স্বগতোক্তি করলো।

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে দেখতে পেল বইয়ের দোকানের কাঁচের ওদিক থেকে একটা লম্বা, হাড়গিলে লোক ওকে দেখছে। মাথায় এক ঝুড়ি সাদাপাকা চুল। জুলি অস্বস্তি বোধ করল। ও বুঝল যতক্ষণ ওকে দেখা যাবে, বুড়োটা ওকে দেখে যাবে।

সিঁড়ির মাথায় একটা দরজায় লেখা,

মিসেস ফ্রেঞ্চ।
ডোমেস্টিক এজেন্সি

ভেতরে অনুসন্ধান করুন।

দরজাটা ঠেলে জুলি একটা ছিমছাম, সাজানো ঘরে ঢুকল। ঘরে ফুল, ঝলমলে রোদ।

জানলার ধারে একটা চালাক-চতুর, মার্জিত মেয়ে বসে টাইপ করছে। মেয়েটির বাদাম-সোনা চুল ওপরে তুলে আঁচড়ানো। লাল বোতাম, সাদা পোষাকটি শরীরে এঁটে বসেছে। ঈর্ষায়, কৌতূহলী আগ্রহে জুলি ওকে দেখতে লাগল।

মেয়েটি ওকে দেখল। হাত তখনও টাইপ করে চলেছে। জুলিকে দেখে ও টাইপ করা থামাল, বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে চেয়ার ঠেলে কাউন্টারে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটি পোষাকের দোকানের মডেলের মতো লম্বা। চলাফেরায় একটা সহজ লাবণ্য আছে। ওকে দেখে জুলির যেন নিজেকে খেলো রঙচটা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে জুলি মনে মনে তেরিয়া হয়ে উঠল।

কিছু চাইছিলেন? মেয়েটি জুলিকে অতর্কিতে জিজ্ঞেস করল। ওর চাউনিতে তাচ্ছিল্য। গলাটা নিচু, কেমন যেন চেনা চেনা।

জুলি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, মিঃ হ্যারি আমাকে মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

–ও আপনি বুঝি জুলি হল্যান্ড, বসুন। একটু অপেক্ষা করুন। মা এখন ব্যস্ত আছেন। বলে ও টাইপ করতে চলে গেল।

জুলি একটু আহত হলো মেয়েটির ব্যবহারে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে হলো। শুধু টাইপের খুটখাট শব্দ আর লাইন শেষের টুং আওয়াজ। মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে লাগল জুলি, আর ভাবতে লাগল, এরা নিশ্চয় ভাল পয়সা দেয়। ফ্রকটার কাটছাঁট সুন্দর, নাইলনের মোজাও পরেছে দেখছি। ওরকম একটা জামা আমার যদি থাকত। আমাকে ওর চেয়ে অনেক ভাল দেখতে।

হঠাৎ মেয়েটি এক তোড়া কাগজ নিয়ে অফিসে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এসে বলল, যান ভেতরে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ একটা বড় টেবিলে জানলার ধারে বসেছিলেন। পরনে মিশমিশে কালো পোষাক। দেখে জুলি মনে ধাক্কা খেল। কেন যেন ওর মনে হল কোন আত্মীয়ের শ্রাদ্ধবাসরে এসেছে। মহিলার কানে ঝোলা জেট পাথরের দুল। মেয়ের রূপলাবণ্যের কিছুই নেই ওর মধ্যে, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আঁটসাঁটো ঠোঁটে আর চিবুকে দুজনের সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট।

মনে হল জুলির বিষয়ে ইনি সব কিছু জানেন, আচমকা কাজের কথা পেড়ে বসলেন।

গ্লেব আমায় তোমার কথা বলেছে। যদি মাথা খাটিয়ে চল, দেখবে কাজটা সহজ। দেখে তো হাবা মনে হচ্ছে না।

জুলি এখনও দাঁড়িয়ে দেখে উনি অধৈর্য হয়ে বললেন, বস, বস। হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখালেন। গলাটা ভারি রুক্ষ।

আজ বিকেলে তুমি ৯৭, পার্কওয়েতে যাবে। অ্যালবার্ট হল কোথায় জান? পার্কওয়ে তার পাশেই। ভুল তোমার হবে না। বাড়িটা যেমন কুচ্ছিত তেমনি বড়। মিসেস হাওয়ার্ড ওয়েসলি তোমার খাস মনিব। তুমি তার চাকরানী হবে। তোমায় ওঁর জিনিষপত্র সামলাতে হবে, পোশাক পরা হয়ে গেলে গুছিয়ে রাখতে হবে, কেউ এলে দরজা খুলতে হবে, ককটেল দেবে, ফুল সাজাবে, টেলিফোন ধরবে। কাজের কথা ধরলে কাজটা সোজা। ও বাড়িতে আরো বাঁধা লোকজন অন্য সব কাজকর্ম করে। খাবার আসে রেস্টুরেন্ট থেকে। মিসেস ওয়েসলি তোমায় থাকা খাওয়ার পর হপ্তায় তিন পাউন্ড দেবেন। প্রতি শনিবার বিকেলে এখানে এসে তোমার বাড়তি টাকা নিয়ে যাবে। বুঝলে তো?

–হ্যাঁ।

মিসেস ফ্রেঞ্চের ভেতর যেন কি একটা আছে, ওর অস্বস্তি হতে লাগল। গাঢ় অন্ধকারে কোন অস্বাভাবিক শব্দ শুনলে যেমন মনে হয় এখনি ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে, ঠিক তেমনি ভয়মেশানো অস্বস্তি।

–তোমার ইউনিফর্ম ওখানে ওই মোড়কে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ কথা বলতে বলতে কানের চুলে হাত দিলেন। যেন কোন গোপন রহস্য টের পেলেন। মুখ হাসিতে ভরে গেল, যদি ফিট না করে, বদলে নিও। মনে হয় ঠিকই হবে। দোহাই ওখানে ময়লা জামা পরোনা, মিসেস ওয়েসলি বেজায় রেগে যাবেন। এই যে তোমার প্রশংসাপত্র। দুটো খাম উনি দিলেন, পড়ে দেখ। মিসেস ওয়েসলি বিশেষ

খুঁটিনাটি দেখবেন না, তবে বলা যায় না। একজন ডাক্তার, একজন ধর্মযাজকের প্রশংসাপত্র। এগুলো জোগাড় করতে আমাকে অনেক খরচও করতে হয়েছে। হারিও না যেন।

ধন্যবাদ। জুলি ঘাবড়ে গিয়ে খামদুটো ব্যাগে ভরল। মিসেস ফ্রেঞ্চ বলে চললেন, এখন বুঝলে তোমায় কি করতে হবে? ওয়েসলিদের কথা তোমায় একটু বলে দিই। তুমি নিজেই টের পেয়ে যাবে, তবু সাবধান করে দিচ্ছি। এরোপ্লেন ডিজাইনার ফার্ম ওয়েসলি বেনটনের সিনিয়ার পার্টনার হাওয়ার্ড ওয়েসলি। কারখানাটা নর্টহোল্ট বিমান ঘাঁটির কাছে। ওয়েসলি সেখানে রোজ যান। ওঁর কথা তুমি পড়ে থাকতে পার। উনি অন্ধ। জ্বলন্ত বয়ার প্লেন চালিয়ে ফেরত আনার জন্যে ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়েছিলেন। প্লেনের কর্মীদের বাঁচিয়েছিলেন নাকি যেন, সব আমার ঠিক মনে নেই। যাইহোক, উনি অগাধ ধনী, অন্ধও বটে।

একটা পেন্সিল নিয়ে মহিলা ব্লটিং-এ দাগ কাটলেন, বললেন, মিসেস ওয়েসলি বিয়ের আগে মিউজিক্যাল কমেডির অভিনেত্রী ব্লানশ ট্যুরেল ছিলেন। তুমি হয়ত ওঁকে দেখে থাকবে। উটের মতো মদ গেলেন ঐ মহিলা। সেই কারণে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিলেন। ওয়েসলি চিরদিন ওঁকে নিয়ে পাগল। উনি নিজেকে ছাড়া কারো জন্যে ভাবেন না। শুনেছি ওয়েসলির টাকার জন্যে ওঁকে বিয়ে করেছেন, এরপর থেকে নরক যন্ত্রণা দেন। ভয়ঙ্কর মেজাজ ওঁর, বেজায় ছোট মন, আর চরিত্র, রাস্তার বেড়ালের মতো সচ্চরিত্র।

একটু ভেবে বললেন, পয়লা নম্বর কুত্তী একটা।

জুলি হতভম্ব হয়ে বলল, আচ্ছা!

মিসেস ফ্রেঞ্চ আবার বলতে লাগলেন, তোমার ওঁকে নিয়ে ঝামেলা হবে। তোমার কাজ বেশ সোজা হবে। মিসেস ওয়েসলিকে বাগানো সোজা হবে না। আর সেজন্য তোমায় এত টাকা দিচ্ছি। টাকাটা কষ্ট করে রোজগার করতে হবে, ভেবনা কাজটা খুব আরামের।

জুলির দিকে খুশি-খুশি চোখে চাইলেন, আমি যদূর জানি উনি তিন হপ্তার বেশী একদিনও চাকরানী রাখতে পারেননি। কিন্তু তোমার কাজই হলো যতক্ষণ না আমি তোমায় ছাড়তে বলছি, ততক্ষণ টিকে থাকা। আমরা তৈরী হবার আগে ভাগে ছেড়ে দিলে সেই পঞ্চাশ পাউন্ড আর পাচ্ছে না। বুঝলে?

জুলি ধারালো গলায় বলল, কিসের জন্যে তৈরী হলে?

আমরা যখন জানাতে চাইব তখন তুমি জানবে। এখন তোমার কাজ হল পার্কওয়েতে গিয়ে ঢোকা আর গেড়ে বসা। আমরা যে টাকা দিচ্ছি, তাতে তুমি খুশী? খুশী না?

–হ্যাঁ। টাকা ঠিকই আছে।

তবে খুশী থাক। প্রশ্ন কোরনা।

দেরাজ খুলে মহিলা বললেন, এখন এস। মুখ থেকে ওই রং মুছে ফেল। মনে রেখো, এখন তুমি চাকরাণী, সিনেমার অভিনেত্রী নও।

–হ্যাঁ। জুলির ঘেন্না হল মহিলার ওপর। টাকাগুলো ও ব্যাগে পুরল।

–মেজাজ সামলে চলো। মিসেস ওয়েসলি যখন কড়কাতে থাকবেন, তখন মেজাজ ঠিক রেখো। খুব হুঁশিয়ার হলেও সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে তখন।

বুঝলাম।

–বেশ। তাহলে এখন কেটে পড়ো। বেরোবার সময় ডানাকে বোল, আমি ওকে ডাকছি।

জুলি ইউনিফরমটা নিচ্ছিল। মহিলার মুখে ডানা নামটা শুনে হাত থেকে মোড়কটা পড়ে গেল প্রায়। তাহলে এই মেয়েটাই ডানা। হ্যারির কথা ওর মনে পড়ল, ও বলেছিল, ডানা তোমার মতো রূপসী নয়, ওর কথা ভাবার দরকার নেই। রূপসী নয়? কেমন করে হ্যারি ওকে মিথ্যেটা বলল? সবই তো আছে, ঠাট, রূপ, ভাল পোশাক। খুব রাগ হলো জুলির। মনটা ভেঙে গেল। হ্যারি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, মেয়েটির কোন মূল্য নেই ওর কাছে। ওরকম মেয়ে

মিসেস ফ্রেঞ্চ হাঁক ছাড়লেন, দেরি করছ কেন? তুমি তো জান এখন কি করতে হবে, না কি জান না?

–হ্যাঁ। জুলি অফিসের বাইরে গেল।

জুলির দিকে পেছন ফিরে ডানা টেলিফোন করছিল, হা, এখন অফিসে আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে জুলিকে দেখে কথা থামাল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ আপনাকে ডাকছেন। জুলি বুঝল ওর নিজের গলা কাঁপছে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ও কান পাতল।

কাঁচের শার্সির ওপাশ থেকে ডানার স্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে বিদায় হলো। একটু বেশ্যা টাইপের, তবে যদি কাজ হাসিল করে...কি বললে? না তা আমি ঠিক জানি না। হ্যাঁ টাকা ওরা সবাই চায়। ওই কথাই তো ভাবে ওরা। ঠিক আছে আজ রাতে কথা বলা যাবে।

কার সঙ্গে ডানা কথা বলছে, জুলি ভাবল। ওর মুখ গরম হয়ে উঠেছে। না হ্যারি নয়। ও কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, ওকে বেশ্যা টাইপের মেয়ে বললে হ্যারি তা বরদাস্ত করবে। অফিসে ঢুকে ডানাকে একখানা চড় কষাতে ইচ্ছে হলো ওর। তারপর হঠাৎ যেন ওর মনে হলো ওর ওপর কেউ নজর রাখছে। ও পেছন ফিরল। ভেতরের অফিস থেকে বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ফ্রেঞ্চ। সিঁড়ির মুখের জানলার রোদ ওঁর কানের দুলে পড়ে ঝম করছে। মিসেস ফ্রেঞ্চ নড়লেন না, কথাও বললেন না। ভয়ঙ্কর ভয় দেখানো হলো ওকে। চেম্বার অফ হররস–এখানে যে সব মোমের মূর্তি থাকে, তাদের মতো পৈশাচিক। জুলি রাগটাগ ভুলে, থতমত খেয়ে সিঁড়ির দিকে পিছিয়ে গেল।

রুদ্ধশ্বাসে বলল, আমি শুনছিলাম না কিছুই।

মিসেস ফ্রেঞ্চ একদৃষ্টে পাথর–পাথর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জুলি ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামল। সিঁড়ির মোড়ে গিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল, আরেকটু হলেই। যে লোকটাকে জুলি পথে দেখেছিল, সে মেয়েটির পেছনে উঠছে। লোকটা জুলির দিকে চাইল না। ওর চোখ সিঁড়ির ওপর দিকে। মুখটা টটকে লাল।

নিচে, বইয়ের দোকানের দরজার কাঁচের ওপর থেকে সেই রোগা, সুটকো লোকটা ওর দিকে চেয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে মে ফেয়ার স্ট্রীটের গরম, ব্যস্ততা, হুড়োহুড়িতে যতক্ষণ না জুলি পৌঁছল, ততক্ষণ লোকটা ওর দিকে চেয়েই রইল।

.

ঝিনুকের বুকের মতো গোলাপী রঙের রাতকামিজের ওপর সিল্কের স্কার্ফ জড়িয়ে ৯৭ পার্কওয়ের সদর দরজা হ্যাঁচকা টানে খুলে খেঁকিয়ে উঠল এক মহিলা, কি চাও? জ্বালাবার আর সময় পাওনি? কেউ বলে দেয়নি আমার চাকরানী নেই? মহিলার ভুরু চুল সব সোনালী সাদা। পুতুলের মতো মিষ্টি ফুটফুটে মুখটা ঘুমের আবেশে ফোলাফোলা। দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন।

জুলি হতচকিত ও অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আপনাকে যদি বিরক্ত করে থাকি, আমি দুঃখিত।

মহিলা তার রাগ চাপবার কোন চেষ্টাই করল না। জুলি বলল, আমাকে মিসেস ফ্রেঞ্চ পাঠিয়েছেন, ভেবেছিলাম আমার আসার কথা আপনি জানেন।

ব্লানশ ওয়েসলি বলল, তবে ভেতরে এস না ছাই। বহুদিন কোন কাজের লোক নেই আমার। তাদের থেকে যা ব্যবহার পাই। সত্যিই!

হলের লাউঞ্জে ঢুকল মহিলা। জুলি সদর দরজা বন্ধ করে পেছন পেছন এলো।

ব্লানশ তার ধারালো আঙুলগুলো সোনালী, কোঁকড়া চুলের ভেতর চালাতে চালাতে বলল, একটু কফি না খেলে আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না। এসে যখন পড়েছো খুঁজে বের করে কফি বানাও। এই যে রান্নাঘর। দয়া করে একগাদা প্রশ্ন কোর না। আমার মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। আগে আমায় কফি দাও। এই প্যাসেজ পেরিয়ে শেষের ঘরটায় আমি আছি।

জুলির দিকে মহিলা এতক্ষণে ভালভাবে চেয়ে দেখল, বলল, আরে তুমি তো দেখছি বেশ ফুটফুটে। এতদিন কুচ্ছিত মুখগুলো দেখে দেখে আমার চোখ পচে গেছে। এই কাজের লোকগুলো যে কেন এত বিতিকিচ্ছিরি হয় আমি ভেবে পাইনা। কিন্তু যাও। দাঁড়িয়ে আছে কেন? কফি বানাতে পারো, না কি তাও পারো না?

–হ্যাঁ। জুলি এক টুকরো হাসলো।

ব্লানশ চোখ কুঁচকে বন্ধ করলো।

–তা ভাল, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে দয়া করে হেসো না। আমার নার্ভে সইবে না। পায়ের সাটিনের চটি জোড়ার দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি চাই আমার সঙ্গে যখন কথা বলবে ম্যাডাম বললে ভাল হয়। তাতে অসুবিধা হবে না আশা করি।

না ম্যাডাম। জুলির মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। মুখটা লাল হয়ে গেল।

চটে গেলে? পেনসিলে আঁকা ভুরু জোড়া কপালে তুলে বলল, তোমাকে চটাবার মতো কি বলেছি? লাল বিটের মতো লাল হয়ে গেলে। আমার মনে হয় ওতে ভারী বিশ্রী দেখায়।

–না ম্যাডাম। পেছনে হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে গেল জুলির।

ব্লানশ আত্মতৃপ্তভাবে বলল, হয়তো চটিয়ে দিতেই পারি, এখন অথবা পরে। মিঃ ওয়েসলি বলেন আমি চাকরদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে জানিনা। হয়ত তা সত্যি। কিন্তু আমার মনে হয় যদি কেউ ভালো মাইনে দিতে পারে, তবে তার যা খুশী বলার অধিকার আছে।

জুলি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনভোলানো ছোট্ট পুতুলের মতো মুখখানা, চুলের রাশি ঘিরে আছে মুখটার চারপাশে, সবশুদ্ধ ওকে বিমোহিত করে ফেলেছে।

ব্লানশ ভুরু কুঁচকে বলল, আমায় চোখ দিয়ে অমন করে গিলোনা। আমায় দেখে তোক চেয়ে থাকে, তাতে অবশ্য আমি অভ্যস্ত। কিন্তু ওরকম বাড়াবাড়ি করলে আমার মেজাজ বেজায় খারাপ হয়ে যায়।

–দুঃখিত ম্যাডাম। জুলি বলল বটে। কিন্তু এই মহিলার এমনই একটা অমানুষী, বর্বর আকর্ষণী ক্ষমতা আছে যে বেশীক্ষণ চোখ ফিরিয়ে থাকা যায় না।

ব্লানশ আঙুল দিয়ে রগ টিপে ধরল আর বলল, আজ সকাল থেকে আমার শরীরটা অসুস্থ লাগছে। আমি যদি মরেও যাই, তাতে কার কি এসে যায়। তারপরই হঠাৎ ভীষণ রাগে ব্লানশ চিৎকার করে উঠল, ঈশ্বরের দোহাই তুমি কি কফিটা আনবে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে গিলবে? আমি কি একটা বেবুন আর আমার পাছা দুটো নীল, যে এমনভাবে দেখছো?

জুলি ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, দুঃখিত ম্যাডাম, আমি এখনি আনছি।

রান্নাঘরে গিয়ে ও তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। মনে মনে ভাবল, আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মহিলা যে এমন আমি ধারণাও করতে পারিনি। বাব্বাঃ কাজটা টিকিয়ে রাখতে গেলে খুব সাবধানে, সামলে চলতে হবে।

জল ফোঁটার সময়ের মধ্যে জুলি তাড়াতাড়ি ফ্রক খুলে, মোড়ক থেকে ইউনিফর্ম বের করে পরল। ভাবল, ইউনিফর্ম পরা দেখলে মহিলা হয়তো খুশী হতে পারেন। আমি যে আমার অবস্থা জানি, তা অন্ততঃ বুঝবেন। জুলি হাসল।

জুলি ট্রে নিয়ে যখন ব্লানশের ঘরে ঢুকল, তখন ঘর চোখ ধাঁধানো আলোয় জ্বলছে। ঘরে বাসি এসেন্স আর ব্রান্ডির গন্ধ। ঘরের বাতাসটা বদ্ধ, ভারি। বিকেল তিনটে বেজে গেলেও একটি পর্দা বা জানলা খোলা হয়নি।

ঘরে অতুল বিলাসোপকরণ, অসম্ভব বিশৃঙ্খলা। তারই মধ্যে পায়চারি করছিল ব্লানশ। হালকা নীল লেপের সেলাই দেওয়া পুরু আস্তরণে দেওয়ালগুলো ঢাকা। নীল-সাদা চামড়ার গদী ঘরের সাদা পুরু কার্পেটের ওপর ইতস্ততঃ ছড়ানো। ইজি চেয়ার ও

লেপমোড়া ডিভান। কারুকার্যকরী ড্রেসিংটেবিলের ওপর পাউডার, পেইন্টের টিউব থেকে পেইন্ট, অনেক শিশি উলটে পড়ে আছে। মেঝেতে, বিছানায়, চেয়ারে পোষাক ছড়ানো। ঘরের চেয়ারে জুতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা।

–কি সময়টাই না নিলে, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ব্লানশ। বলল, এখানে কাজ করতে চাও তো আরো তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। বুঝলে?

জুলির দিকে পিটপিট করে চেয়ে দেখে বলল, একি পোষাক বদল করা হয়েছে দেখছি। বা তোমায় ভালই দেখাচ্ছে। কি সুন্দর ইউনিফর্ম। বিছানার পাশে একটা টেবিল দেখিয়ে বলল, ওখানে ট্রেটা রেখে চলে যাও। হয়তো বাথরুমটা পরিষ্কার করতে পারো। তারপর আমরা কথা বলব। ওই যে বাথরুম। কয়েক মিনিট বাদে কথা কইব।

বাথরুমটা দেখে জুলির হিংসে হল। আলাদা ঘরে শাওয়ার, মেঝেতে নিচু বাথটাব, ড্রেসিংটেবিল, মুখ ম্যাসাজের মেশিন, গিজার, চুল শুকোবার যন্ত্র। একটি অলস, আহ্লাদে মেয়ের সমস্ত চাহিদার সম্ভার সাজানো। শোবার ঘরের মত সবই আছে, কিন্তু এখানেও চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। বাথটাব খালি করা হয়নি। দুধের মতো তোয়ালে জলে ভাসছে। মেঝেতে ছড়ানো ছিটোনো বাথসল্টগুলো জুলির জুতোর চাপে ভাঙতে লাগল। জুলি মুখ মোছর টিস্যু কাগজ, ক্রীমমাখা হাত–তোয়ালে তুলতে লাগল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাথরুমটা পরিষ্কার করে ফেলল। টবটা খালি করল, ভোয়ালেটা নিংড়ে মেঝে মুছে ফেলল।

ও যখন শোবার ঘরে এলো, ব্লানশ তখনো পায়চারি করেই চলেছে। ড্রেসিং টেবিলের পেছন থেকে উঁকি মারছে অর্ধেক ব্র্যান্ডি বোঝাই পাত্র।

–এই তো তুমি এসে গেছে, ব্লানশ হাসল। এখন ওকে আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এবং আরো খুশী খুশী।

–তোমার নামটা কি জিজ্ঞেস করিনি, করেছি কি? করিনি বোধহয়।

জুলি হল্যান্ড, ম্যাডাম।

ব্লানশ একটা ইজিচেয়ারে বসল, এক লহমা চোখ বুজল, তারপর মুখ তুলে জুলিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখল।

তুমি কি বললে মিসেস ফ্রেঞ্চ তোমায় পাঠিয়েছেন। আমার আজকাল কিছুই মনে থাকছে না।

–হ্যাঁ, ম্যাডাম।

–ঠিক আছে। মনে হয় তোমায় দিয়ে কাজ চলবে। তোমার প্রশংসাপত্রটা আছে কি?

জুলি দুটো খাম বের করে ওনার হাতে দিল।

ব্লানশ খামগুলো খুলতে খুলতে বিরক্ত হয়ে বলল, মেয়েছেলেটা এত পাকা কাজ করে। প্রশংসাপত্রগুলোয় চোখ বুলিয়ে ছুঁড়ে টেবিলে ফেলে দিয়ে বলল, তোমায় মাইনের কথা বলেছে। বোধহয়?

–হ্যাঁ, ম্যাডাম।

–ঠিক আছে। ধরে নাও আজ থেকে তুমি বহাল হলে। একটু ঝুঁকে আয়নায় মুখ দেখে বলল, দেখা যাক, কেমন মানিয়ে চলতে পার। কফিটা তো ভালই বানিয়েছে। তুমি বাড়িটা পরিষ্কার রাখবে আর আমি যখন বলব তখন কাজ করবে, এইটুকুই মাত্র চাই। এই প্যাসেজের ওদিকে তোমার ঘর। ঘরটা ভাল। লোকজনকে আরামে রাখায় বিশ্বাসী আমি। তুমি এখনি কাজ শুরু করতে পারো।

–হ্যাঁ, ম্যাডাম।

ব্লানশ চিরুনী তুলে নিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল।

–আজ রাতে আমি বাইরে থাকব। তুমি এখনি চলে এসো এখানে। ফ্ল্যাটটা খালি রাখতে চাই না আমি। তোমার কি মনে হয় এখনি আসতে পারবে?

–হ্যাঁ, ম্যাডাম। এই ঝকঝকে পুতুলটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ক্লান্তি বোধ করছিল জুলি।

–রাতে একা থাকতে আপত্তি নেই?

জুলি অবাক হল, না ম্যাডাম, মোটেই না।

ব্লানশ অলস ভঙ্গীতে বলল, কি সাহস তোমার। আমার একা থাকতে বিরক্ত লাগে। মিঃ ওয়েসলি গত পনেরো দিন যাবৎ প্যারিসে, আমার ভয় করে। কে জানে কখন কে ঢুকে পড়বে। আজকাল রাতে এতসব অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আর চুরিও বেড়ে গেছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এ বাড়িতে ভূত আছে। তোমার ভূতের ভয় নেই?

জুলি জোর দিয়ে বলল, না, ম্যাডাম।

কল্পনাটল্পনা না থাকা নিশ্চয় ভাল। ব্লানশ ওর চুলের কোকড়াগুচ্ছে হাত বুলোত বুলোতে বলল, আমি এত অনুভূতি কাতর, এমন ভিতু! একেকবার আমার মনে হয়, সত্যি যেন কেউ প্যাসেজ দিয়ে আসছে, যাচ্ছে। সে বোধহয় আমার নার্ভের জন্য।

কিংবা মদের ঝোঁকে ঝুঁদ হয়ে থাক বলে, জুলি মনে মনে ভাবল, হাসতে ইচ্ছে করল ওর। মুখে বলল, স্নানের জল ভরব ম্যাডাম?

–ভর। একটা ব্যাগ গোছাতে হবে। কাল সন্ধ্যের আগে আমি ফিরছি না। মিঃ ওয়েসলিও সেই সময় নাগাদ ফিরবেন। আমার অনেক কাজ থাকে। বহুদিন কোন লোক নেই। আমার সব অগোছালো হয়ে আছে। সব ঠিক করে গোছাতে হবে। লক্ষ্মীমেয়ে, ঐ কাবার্ডটা খোল। ওইটে। দেখ, আমার প্রতিটি পোশাকের আলাদা নম্বর আছে। ঐ যে হ্যাঙারে ঝুলছে।

ঘরে তিনটে বিশাল বিশাল কাবার্ড। তাতে ঠেলে বন্ধ করার দরজা। জুলি সেটা খুলে দেখল, সারি সারি পোক ঝুলছে, ফ্রক আর ইভনিং গাউন।

প্রত্যেকটা পোষাকের সঙ্গে ম্যাচিং-করা টুপি, নিচের পোষাক, দস্তানা, ব্যাগ আর জুতো আছে। ব্লানশ ক্লান্ত, ক্ষীণ গলায় বলল, নিয়মটা আমিই বের করেছি। প্রত্যেকটা জিনিষের নম্বর আছে। নম্বরী জিনিষগুলো মিলিয়ে একসঙ্গে রাখাই তোমার কাজ। পারবে বলে মনে হচ্ছে?

–হ্যাঁ ম্যাডাম।

–ওখানে একটা আলমারী আছে। দেওয়ালের ভেতর গাঁথা, দেখতে পাবে না। ওটা আমি নিজে দেখেশুনে রাখি। ওতে আমি ফারের জিনিষ আর গয়না রাখি। এখন তুমি তাড়াতাড়ি স্নানের জল দাও। আমাকে পাঁচটা কুড়ির ট্রেন ধরতে হবে। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ব্লানশ যখন স্নানের ঘরে গেল, জুলি তখন শোবার ঘরটা খুব ভাল করে পরিষ্কার করল। সন্ধ্যেবেলা এত তাড়াতাড়ি ছুটি পাবে ও ভাবেনি, তাই ভাবল সন্ধেবেলাটা কিভাবে কাটাবে। যদি ও হ্যারির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত, তাহলে দুজনে একটা সিনেমায় যেতে পারত। কিন্তু যোগাযোগের তো কোন উপায় নেই। তবে হ্যারি বলেছিল মিসেস ফ্রেঞ্চ ওর কাছে খবর পৌঁছে দেবেন। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

ব্লানশকে রওনা করা একটা প্রাণান্তকর অবস্থা। মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। দুবার সুটকেশ খুলতে হল, কেন না, ব্লানশ কি নিয়ে যাবে আর কি নিয়ে যাবেনা, স্থির করতে পারছিল না।

তারপর যখন সব ঠিকঠাক গোছগাছ হল, জুলি ট্যাক্সির জন্যে ফোন করতে যাবে, তখন ব্লানশ খুঁতখুঁত করতে লাগল আর ঠিক করল যাবে না।

ইজিচেয়ারে ধপ করে এলিয়ে পড়ল ও। পোষাক পরে, মুখে রঙ মেখে ওকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল। রংচঙে আকর্ষণীয় একটা পুতুল যেন। বসে পড়ে বলল, সত্যি মনে হচ্ছে আমি এত ঝামেলা করতে পারবো না। আমি যে ওদের তেমন পছন্দ করি তাও নয়। ওরা এত খারাপ যে বলার কথা নয়। তাছাড়া আমার শরীরও ভাল লাগছে না। আমি যাব না...ব্যস। সব ভাজ নষ্ট হবার আগেই সুটকেশ খুলে তুলে দাও আলমারীতে।

তারপর হঠাৎ যেন যন্ত্রণা হচ্ছে এমনি গলায় ও চেঁচিয়ে উঠল, বেচারা জুলি! আমাকে তো যেতেই হবে। আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম বাকী ওখানে থাকবে। ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে আমাকে। শিগগীর সব ভর, নাহলে আমি ট্রেন ধরতে পারবো না। তোমায় এত খাটাচ্ছি বলে আমি যে কি দুঃখিত তা কি বলব।

জুলির তখন চোখ ফেটে জল আসার যোগাড়। সমস্ত জিনিষ দুমদাম সুটকেশে ভরতে লাগল। ও যেই ডালা বন্ধ করতে যাবে, অমনি ব্লানশ বলল, না জুলি এখনি বন্ধ কোর না। কি যেন...ঐ আমি ঐ গোলাপ-বেগুনী জামাটা নেব না। নিচের দিকে আছে, ওটা পড়লে আমাকে মড়ার মতো দেখায়।

জুলির তখন রাগে ব্লানশের গলা টিপে মারতে ইচ্ছে করছে। হ্যাঁচকা টানে জামাটা বের করতে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ওকে রেগে যেতে দেখে ব্লানশ একটা পালটা চাল চাললো।

খুব আলতো করে বলল, তুমি কি গাউনটা নিতে চাও জুলি? আমার ওটা ভাল লাগে না। জিনিষটা অব্যবহারে নষ্ট হবে কেন?

জুলি মেঝেতে বসে পড়ল, ওর সব রাগ গলে জল হয়ে গেল।

–কি বললেন ম্যাডাম? গাউনটা ও আঙুল বুলিয়ে আদর করল।

জামাটা সুন্দর, তাই না? হার্টনেলের তৈরী। রংটা আমার ভালো লাগে না। ভেবেই পাই না, কেন ওটা কিনেছিলাম। তুমি চাও ওটা?

আমি? জুলির চোখে খুশীর ঝিলিক, হ্যাঁ, নিশ্চয়। ধন্যবাদ ম্যাডাম।

ব্লানশ তখন নিষ্ঠুর, একঝলক হাসি হাসল, যা দেখে জুলির আশা দপ করে নিভে গেল। আর তখনি ব্লানশ বলল, আমি ভেবে দেখবখন। আমি এটা দিতে পারব না। ঐ দেড়শো গিনি না কত যেন দাম লেগেছিল ওটার। বিশ পাউন্ড দিলে আমি তোমায় ওটা দিয়ে দিতে পারি।

আশাভঙ্গে জুলি চেয়ারের পিঠে পোষাকটা রেখে নিচু হয়ে সুটকেস গোছাতে লাগল।

ব্লানশ কায়দা করে বলল, তোমার নিশ্চয়ই একটা পোষাকের পেছনে বিশ পাউন্ড খরচ করার ক্ষমতা নেই?

–না ম্যাডাম। জুলি মুখ ফিরিয়ে নিল।

যাগে কিছু ভেবনা। দুঃখের কথা এই যে, তোমার অবস্থার একটি মেয়ে পোষাকটা পরলে নেহাত বেমানান হতো। সবাই তোমায় দেখে হাসত। তার চেয়ে আমি টাইম কাগজে বিজ্ঞাপন দেব, দিতে পারি না?

জুলি চট করে একবার ব্লানশের মুখের দিকে চেয়ে, ওর বিকৃত উল্লাস দেখে বুঝল যে, ব্লানশ ইচ্ছে করে ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে মজা পাচ্ছিল।

মনে মনে জুলি বলল, ঠিক আছে, নোংরা বিল্লী কোথাকার, তামাশা কর। তবে তোমার ফাঁদে আমি ধরা দিচ্ছি না।

ব্লানশ চলে যাবার পর জুলি ভাবল, ও যদি আমার মাথা খারাপ করে দেবার চেষ্টায় থাকে তবে সে গুড়ে বালি। সামনে চব্বিশ ঘন্টা ও থাকছে না। হ্যারি ওর কি ক্ষতি করবে করুক, আমি তোয়াকাও করি না। হ্যারিকে সাহায্য করতে যদি ওর নাকটা খুবলে নিতে হয় নেব।

জুলির মনে হল, এখন দু-ঘন্টা মতো ফ্ল্যাটটার পেছনে খাটলে তবে পরিষ্কার করে উঠতে পারবে। হ্যারির সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হলে সাতটায় ওরা দেখা করতে পারে।

জুলির মিসেস ফ্রেঞ্চের ওখানে ফোন করার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আর তো কোন উপায়ও নেই। তাই একটু ইতস্ততঃ করে ও ফোন করল।

ডানা ফোন ধরল।

ডানার গম্ভীর গলা শুনে জুলি আড়ষ্ট হয়ে বলল, জুলি হল্যান্ড কথা বলছি। আমি মিঃ গ্লেবের– সঙ্গে কথা বলতে চাই, তার নম্বরটা পেতে পারি কি?

ধরুন। ডানা বলল।

খট করে টেবিলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ডানা। জুলি শুনতে পেল, সেই হল্যান্ড মেয়েটা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

হ্যারির কথা শুনে জুলি অবাক হয়ে গেল।

–কি হয়েছে? হ্যারির গলায় ধার।

–কিছু না, সব ঠিক আছে। সন্ধ্যেটা একদম ফাঁকা। মিসেস ওয়েসলি বাড়িতে নেই। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। সাতটা নাগাদ দেখা করতে পারি?

হ্যারি যেন বিরক্তস্বরে বলল, দুঃখিত, আমি এখন খুব ব্যস্ত।

–কিন্তু হ্যারি, তবুও আমরা দেখা করতে পারি নিশ্চয়। জানি না আবার কবে ছুটি মিলবে। এখন আমি একেবারে একা। কিছু করার নেই আমার।

–বিশ মিনিটের মধ্যে ট্রেন ধরব। আমি দুঃখিত, আমার কিছু করার নেই। যখন ফিরব তখন পারলে দেখা করব। এক মিনিটও সময় নেই। চলি। হ্যারি ফোন রেখে দিল।

জুলির রাগ হয়ে গেল। ভাবল, গোল্লায় যা সব! উচ্ছনে যাক! খুব বিপদে পড়া গেল। কারোর সঙ্গে কথা বলা যাবে না, বেরোনো যাবে না। সন্ধ্যেটা ফাঁকা, কি দুর্ভাগ্য! এত সহজে হ্যারিকে পেলাম, আর ও আমার সঙ্গে আর একটু ভালভাবে কথাও বলল না। হাজার হলেও আমরা প্রেম করছি।

তারপর ও ভাবল, হয়তো ডানা শুনছিল বলে হ্যারির কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই ঐভাবে কথা বলেছে।

খানিকক্ষণ পর, নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে ও নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার দুঃখ ভুলে গেল। নিজের ঘর দেখে তো ও ভীষণ খুশী। এ ফ্ল্যাটের অন্যান্য ঘরের মত এ ঘরেও সুসজ্জিত আসবাব, টেলিফোন, বিছানার পাশে ট্রানজিস্টার আর সঙ্গে পরিচ্ছন্ন একটা বাথরুম রয়েছে।

এর মধ্যে জুলি ফুলহ্যাম প্যালেস রোডে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে বাক্স গুছিয়ে নিয়ে এসেছেনতুন আস্তানায়। এই নতুন জীবনে, বিশালবাহুল পরিবেশে ওর নিজেকে আর উপেক্ষিত মনে হল না। এই সুন্দর ঘর, গরম জলে স্নান, রেডিও, ফোন, হ্যারিকে দেখতে না পাওয়ার, সঙ্গ না পাওয়ার দুঃখ ভুলিয়ে দিলো। আর এই আরামপ্রদ বিছানায় সব ক্লান্তির অবসান।

সাড়ে এগারোটায় রেডিও বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে যাবে, এমন সময় ও শুনতে পেল এই ফ্ল্যাটের কোথায় যেন একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। আওয়াজ শুনে। ওর হাত থেমে গেল। অস্বস্তি নিয়ে, কানপেতে ও অপেক্ষা করতে

লাগল। ছোট্ট নিস্তব্ধ ঘরটাতে অপেক্ষা করতে করতে ওর মনে পড়ল মিসেস ব্লানশের কথা, আমার একা থাকতে ভয় করে, আমি জানি এখানে ভূত আছে। রাতে এমন সব শব্দ হয়।

জুলি ভাবল, ঐ কথাগুলো হয়ত ও আমায় ভয় দেখাতে বলেছিল। আবার আলো নেভাতে যাবে দেখল পর্দাগুলো ফুলে ফুলে উঠে থেমে গেল। নিজেকে ভরসা দিল, ও কিছু নয়, বোধহয় বাতাসে...। কিন্তু ও সতর্ক হয়ে শুনতেই লাগল।

ফ্ল্যাটটায় কোন আওয়াজ ঢোকে না এমনভাবেই তৈরী। এখন ঘড়ির আওয়াজ আর বুকের দ্রুততালে ধধ ছাড়া আর কোন শব্দই নেই।

অধীর হয়ে ও আলো নেভাল। ঘর অন্ধকার হয়ে যেতেই ও ভাবতে লাগল, ফ্ল্যাটে কি কেউ ঢুকেছে? পর্দা সত্যিই কি বাতাস লেগেই ফুলে উঠছিল?

নাঃ...এ একেবারেই যাচ্ছেতাই! আমি যদি ভয় না পাই, তবে এ ফ্ল্যাটে এমন কিছুই নেই আমায় ভয় দেখাতে পারে। জুলি ভাবল।

ঠিক তখন ও স্পষ্ট শুনতে পেল, একটা নরম, মৃদু মৃদু পা ফেলার আওয়াজ ওর ঘরের দিকে আসছে। ওর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এ তো ভুল হবার কিছু নেই।

বিছানার পাশের বাতিটা জ্বালতে গিয়ে বাতিটা মেঝেয় উটে পড়ে গেল। কার্পেটের ওপর আলোটা পড়ে যেতেই ও বিছানা থেকে ঝুলে, হন্তদন্ত হয়ে ওটা খুঁজতে লাগল। বুকের

ভেতর হৃদপিণ্ডটা উঠছে আর নামছে। তারপর ও টের পেল অন্ধকারে দরজার হাতলটা ঘুরে যাচ্ছে, তখনি ওর খেয়াল পড়ল দরজায় তালা বন্ধ করা হয়নি।

দরজা খুলে যেতেই প্যাসেজের আলোর রেখা ঘরে এসে ঢুকল। জুলি বিছানার ওপর গুঁড়ি মেরে পিছিয়ে গিয়ে, ঘাড় গুঁজে ভয়ে কাঁটা হয়ে বসে রইল। মেঝের ওপরে সরু আলোতে ভয় দেখানো ছায়া। দরজাটা খুলছে না আর। প্যাসেজে কার নিঃশ্বাসের নরম আওয়াজ।

এত ভয় পেয়ে গেল জুলি যে ওর মুখ থেকে একটা আওয়াজ বেরোল না। ভয়ে থ মেরে গেল।

সাদা অস্পষ্ট কি যেন একটা দরজার ওপারে এগিয়ে এলো। জুলির ভেতরে একটা আর্তনাদ ফেটে পড়বে বলে ডেলা পাকিয়ে উঠল। গলা দিয়ে একটা ভাঙা, বিকৃত আওয়াজ বেরোল শুধু।

আলো জ্বলে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে ওয়েসলি। আলোছায়ায় ওকে একটা উল্লসিত প্রেতের মত দেখাচ্ছে।

জুলি আবার চেঁচাল।

ব্লানশ নিষ্পাপ গলায় বলল, আমি কি তোমায় বিরক্ত করলাম? ভেবেছিলাম চুপিচুপি এসে দেখে যাবো তুমি ঠিকমত শুয়েছে কিনা।

নীল ফুলের মত নীল চোখদুটো জুলির আতঙ্কিত মুখে স্থির হয়ে এঁটে রইল। ব্লানশ আবার বলে উঠল, শেষ অবধি মত পালটালাম। শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরলাম। তোমায় অজানতে ভয় পাইয়ে দিয়েছি বলে দুঃখিত।

হঠাৎ ব্লানশের মুখে উল্লসিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল, তুমি বলেছিলে না তুমি ভিতু নও, বলেছিলে কিনা? না কি তুমি শুধুই বড়াই করেছিলে?

আলো নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ব্লানশ বলল, গুড নাইট জুলি।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

.

অদ্ভুত, বিকৃত মানসিক অবস্থা ব্লানশের। ওর মাথায় হয়তো কোন গোলমাল আছে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে জুলি। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে জুলি বুঝল ও যতই হুঁশিয়ার হয়ে চলুক, ব্লানশের সঙ্গে ও এঁটে উঠতে পারবে না। এবং তাই চট করে ও ফাঁদেও পড়ল।

প্রাতঃরাশ তৈরী করতে করতে জুলি ভাড়ার রাখার কাবার্ড থেকে চা নিয়ে আসছে, হঠাৎ দেখল আলো আঁধারে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে ওর শরীর ছেড়ে যেন প্রাণটা বেরিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার শরীরে এসে ঢুকল। এই অতর্কিত আঘাতে রান্নাঘরটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল, খানিক বাদে জুলির মাথা ঘুরতে লাগল, খানিক বাদে স্নায়ু বিপর্যয়ে জুলির পেশী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে

গেল, ও মেঝেতে এলিয়ে পড়ল। বেশ কয়েক মিনিট কাটলে জুলি সাহস সঞ্চয় করে দেহটার দিকে তাকাতে বুঝল ওটা ভয় পাবার মত কিছু নয়, কয়েকটা জামাকাপড়ে কুশন ভরে ওটা বানানো হয়েছে। জুলি বুঝল ব্লানশ আবার টেক্কা দিয়েছে।

রান্নাঘরে এসে কাঁপা কাঁপা হাতে ও এক কাপ চা তৈরী করে বসল। ভাবল, এরকম যদি চলতেই থাকে তবে ওকে কাজটা ছাড়তেই হবে। অতটা ভয় পাওয়া আমার বোকামি হয়েছে, কিন্তু কে বুঝবে অত মন দিয়ে মেয়েছেলেটা মরাটা বানাবে?

পরে ও দেরাজে পদাটর্দা তুলছে হঠাৎ গুটোনো চামড়ার কি যেন একটা হাতে ঠেকল। তাকিয়ে দেখল দেরাজের নিচে একটা কুণ্ডলী পাকানো ভয়ানক সাপ। দেখে ও পাথর হয়ে গেল। সাপে ওর ভীষণ ভয়, কান ফাটানো চীৎকার করে ও দরজার দিকে ছুটল।

ভয়ের চমকটা কাটতে ও এটাও ব্লানশের চমক ভেবে ফিরে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দেরাজটা দেখল। কাঁচের চোখ, ভেতরে অন্য জিনিষ ঠাসা, তবু ওটা সাপই বটে। শিউরে উঠে ওটা কাপড় চোপড় চাপা দিয়ে দেরাজটা বন্ধ করল। ভয়ে হাত-পা খুলে যাবার যোগাড়, ঠিক তখনই বেল বেজে উঠতে ও চমকিয়ে লাফিয়ে উঠল।

দরজা খোলার কথা খেয়ালই নেই ওর। সম্বিত ফিরে আসতে দেখল একটি লম্বা, সুসজ্জিত চেহারার লোক ওকে শীতল উৎসুক চোখে দেখছে।

–মিসেস ওয়েসলি ওঠেনি বোধহয়? লোকটা ওকে নালিশের ভঙ্গীমায় জিজ্ঞেস করল। তারপর সটান ভেতরে ঢুকে জুলির হাতে কোট আর টুপিটা দিল। জুলি টুপিটা নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা হাতের দস্তানা খুলে টুপিতে ফেলল।

জুলি বলল, না, মিসেস ওয়েসলি ওঠেননি। ভাবল, লোকটা কে? কি চায়?

–আমি মিঃ হিউ বেনটন, মিঃ ওয়েসলির পার্টনার, লোকটা বলল। ওর মুখটা পাতলা, নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, রং ফ্যাকাশে, চুল সাদাটে, ঠোঁট রক্তশূন্য, চোখ হলদেটে। গলার স্বর যেন, ও গির্জার ভেতর কথা বলছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও জুলিকে, যেন অশ্ববিক্রেতা সদ্য খরিদ করা ঘোড়া দেখছে। বলল, তুমি বোধহয় নতুন চাকরানী? মিসেস ওয়েসলিকে বলবে আমি এসেছি।

–এত তাড়াতাড়ি ডাকা উনি পছন্দ করেন না।

–বাঃ, বেশ! লোকটি হাসল। ছোট ছোট দাঁতগুলো এমন যান্ত্রিক ভাবে দেখাল যে ওটাকে হাসি বলা যায় না। বলল, তোমার চেয়ে আমি মিসেস ওয়েসলিকে অনেক বেশীদিন ধরে চিনি। ওঁর অভ্যেস আমার জানা আছে। বল, আমি এসেছি।

–কিন্তু আমার মনে হয়না...। জুলি বলতে গেল। ও তো জানে সকাল সাড়ে এগারোটায় ডাকলে ব্লানশ কি রকম খেপে যেতে পারে!

বেনটন মুখ বিকৃত করে বলল, তুমি কি মনে করবে সে জন্যে তোমায় মাইনে দেওয়া হয় না। যা বলা হবে তা মেনে চলার জন্যে মাইনে দেওয়া হয়।

জুলি পেছন ঘুরে ব্লানশের ঘরের দিকে গেল। ঐ লোকটাকে এত কথা বলতে সুযোগ দিয়েছে। বলে ওর নিজের ওপরে রাগ হতে লাগল। দরজায় টোকা দিয়ে ও ঘরে ঢুকল।

ব্লানশ ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে শুয়ে আছে। হাতের কাছে টেবিলে ব্রান্ডির পাত্র।

মুখ তুলল ও। ফ্যাকাশে, ফোলা ছোট্ট মুখটা কঠিন হয়ে উঠল।

–আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সব সময় ঘরে ঢুকতে পার বলিনি, বলেছি কি? ওর চোখ রাগে ঝক্ঝক্ করে উঠল। বলল, দরকার হলে ঘন্টা বাজিয়ে তোমাকে ডাকব। বেরিয়ে যাও।

জুলি আস্তে আস্তে বলল, আপনাকে বিরক্ত করায় দুঃখিত। কিন্তু মিঃ বেনটন এসেছেন, আপনাকে ডাকতে বলছেন বারবার। আমি বলেছি আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন।

সমস্ত রাগ মিলিয়ে গিয়ে ব্লানশ ধড়ফড় করে উঠে বসল।

–হিউ? এই অসময়ে? ওকে দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে না। জুলি ঘরটা তাড়াতাড়ি সাফ কর। আমার মেকআপের বাক্সটা দাও। তাড়াতাড়ি। মরা মাছের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।

এ যে অন্য এক ব্লানশ। সেই নিষ্ঠুর, পিশাচী, অধীর, বিকারগ্রস্ত ব্লানশের চেয়ে এই ছটফটে, ছোট মেয়ের মত উত্তেজনায় অধীর ব্লানশ যেন আরো ঘৃণ্য।

ব্লানশ দ্রুততার সঙ্গে মুখে রং মাখতে লাগল। জুলি ছুটোছুটি করে ঘরের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে। বাগে আনতে লাগল।

ফ্যাকাশে গালে রং লাগাতে লাগাতে ব্লানশ হুকুম দিল, চারিদিকে সুগন্ধী ছড়াও। ঘরে কি দুর্গন্ধ। রুজের তুলি রেখে এক চুমুকে ব্রান্ডি খেয়ে গ্লাসটা রেখে বলল, তাড়াতাড়ি একটা জানলা খোল। এমন টেনে টেনে ছুটছো যেন তোমার পিঠ ভেঙে গেছে।

রুদ্ধশ্বাসে জুলিকে যা যা ছড়ান, ছেটানো, গোছান করতে বলা হলো ও সব করল। নোংরা। তোয়ালেগুলো বান্ডিল করে বাথরুমে রাখল।

যখন ও বাথরুম থেকে ঘরে এল, তখন দেখল ব্লানশ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে, সুডৌল হাত দুটো মাথার ওপর ভাজ করা, দেখে মনে হয় এক মোহময় আকর্ষণের মূর্তি।

সেই ফ্যাকাশে, সাদাটে মেয়েছেলেটার এমন স্বপ্নের আশ্চর্য রূপান্তর দেখে জুলি ঈর্ষায় জ্বলে উঠল, ভাবল, ওঃ, খুকি পুতুলটি সাজগোজের জানেটা কি?

ব্লানশ খ্যাচ করে উঠল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় গিলছো কি? ওকে ডাক।

বেনটন লাউঞ্জে মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিরক্ত, বিরস মুখে পায়চারি করছিল। জুলি ঢুকতেই বলল, তৈরী হয়েছেন উনি? তুমি তো অনেকক্ষণ গেছে।

দয়া করে এদিকটায় চলুন। ওর সামনে হাঁটতে হাঁটতে জুলির অস্বস্তি হচ্ছিল। ও যখন ব্লানশের দরজার কাছে পৌঁছল বেনটনের একটা হাত ওর উরু স্পর্শ করল। ঠিক যেন একটা মাকড়সা হেঁটে গেল, জুলি শিউরে উঠল।

ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে জুলির দিকে চেয়ে থেকে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতটা সরিয়ে নিল। তারপর ব্লানশের ঘরে ঢুকে সরু গলায় বলল,

–ও ব্লানশ! কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়, কি তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে। দরজাটা ঠেলে দিল। পুরো বন্ধ করল না। জুলির সারা শরীর জুড়ে তখন শিহরণ। ও শুনল বেনটন বলছে, খবর আছে, হাওয়ার্ড তার করেছে, সোমবারের আগে ফিরছে না।

সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী কোথাকার! ব্লানশ হেসে বলল।

বেনটন ধীরে ধীরে বলল, নয়ই বা কেন? আজ বিকেলেই আমি আবার আসতে পারি। আমরা পুরো শনিবারটা একসঙ্গে কাটাতে পারবো।

ব্লানশ বলল, ডার্লিং দরজাটা বন্ধ করে দিলে হয়না? ফ্ল্যাটের চতুর্দিকে কুকীর্তির কথা রটিয়ে দিতে চাওনা নিশ্চয়ই।

জুলি তাড়াতাড়ি সরে এলো। ভাবল, ওঃ জুটি বটে একখানা। মরুকগে ওরা। তবে কি ব্লানশ সত্যিই পুরো শনিবারটা বাইরে থাকছে?

তখনি ওর হ্যারির কথা মনে পড়ল। কাল হ্যারি ম্যানচেস্টার থেকে ফিরছে। নানারকম প্ল্যান করে কাজ নেই। ওই ব্লানশ নাও যেতে পারে আর হ্যারিও নাও ফিরতে পারে। হয়তো জুলিকে এই লম্বা দুটো দিন একলা এই নির্জন ফ্ল্যাটে কাটাতে হবে।

অনেক পরে বেনটন ব্লশের ঘর থেকে বেরোল। জুলি রান্নাঘর থেকে শুনল ও প্যাসেজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে রান্নাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

জুলি টেবিলে পিঠ রেখে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল।

–আপনি কি কিছু চান? জুলির ঠাণ্ডা গলা।

–চাই। হা...আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

জুলি তখন মনে মনে রুখে উঠছে আর ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে দেখতে দেখতে বেনটন ব্যাগ থেকে পাঁচ পাউন্ডের একটা নোট বার করল।

–হ্যাঁ। নোটটা ছোট্ট, নিখুঁত ভাজ করল বেনটন, কি যেন বলছিলাম। ভাজকরা নোর্টটা আঙুলের গাঁটে ঠুকতে ঠুকতে বলল, তুমি মিসেস ওয়েসলির খাস চাকরানী। হয়তো অনেক কিছু দেখবে বা শুনবে, যা তোমার আওতার মধ্যে নয়। একজন খাস চাকরানী গাবিয়ে বেড়ায়না। বুঝলে?

জুলি রেগে লাল হয়ে বলল, সে কথা আপনাকে বলে দিতে হবে না।

বেনটনের ভুরু দুটো কপালে উঠে গেল।

–দোহাই তোমার। রেগে যেওনা। মিসেস ওয়েসলি অসম্ভব ঝামেলা পাকাতে পারেন। বেশীর ভাগ সময়ই উনি চাকরানীদের এক সপ্তাহের বেশী রাখতে পারেন নি। আমার মনে হয় ওর চাকরানী অর্থাৎ তুমি, তোমার সঙ্গে আমার একটু কাজের কথা আছে।

এক মুহূর্ত মাত্র জুলি ইতঃ করল। সে তো এই কাজের ফাঁদে পা দিয়েছে লুটে নেবার জন্যে? তাহলে ঐ ফ্যাকাশে লোকটা ওকে ঘুষ দিলে নিতে বাধা কোথায়? পাঁচ পাউন্ড! পরে হয়তো আরো দেবে। বেনটনের চোখজোড়ায়, চোখ রেখে, হয়তো হয়েছেবলতে জুলির সাহস দরকার হল।

–আমি জানি আমি ভুল বুঝিনি তোমায়। দেখ আমি চাই না মিঃ ওয়েসলি কিছু কথা জানুন। বেনটন মুখে বিকৃতি নিয়ে বলল, উনি অন্ধ। আর জানবে অন্ধরা ভয়ানক খুতখুতে, সন্দেহবাতিক হয়। আমি ওকে আঘাত দিতে চাই না।

বুঝেছি।

বেনটন বলে চলল, এ ফ্ল্যাটে কি হচ্ছে না হচ্ছে, যতক্ষণ তুমি দেখতে যাচ্ছে না, শুনতে যাচ্ছে না, ততক্ষণ তুমি আমি বেশ মানিয়ে চলতে পারব। এই ধর, আজ সকালে আমি এখানে

আসিনি। বুঝলে?

জুলি মাথা নেড়ে বোঝাল সে সবকিছু বুঝেছে।

এই বন্দোবস্তটা তোমার–আমার মধ্যেই থাকুক। মিসেস ওয়েসলি এটা পছন্দ নাও করতে পারেন।

আবারও জুলি মাথা নাড়াল।

চমৎকার।

বেনটন সোজা হয়ে দাঁড়াল। লম্বা লোকটার গায়ে ল্যাভেন্ডার আর চুরুটের গন্ধ। নোটটা জুলির হাতে দিয়ে আদরের ভঙ্গিতে বাহুতে চাপড় মারল। ওর স্পর্শে শিউরে উঠে জুলি পিছু হাঁটল। কিন্তু পিছনে টেবিল। বেনটন ওকে টেবিলে ঠেসে ধরল। এই ভয়াবহ মুহূর্তে জুলি ভাবল ও বুঝি ওকে চুমো খাবে। কিন্তু বেনটন তা না করে সরে গেল। দরজা খুলতে খুলতে বলল, যেখান থেকে এটা এলো, সেখানে আরো নোট আছেজুলি। সুতরাং সহজ কথাটা বুঝেছো নিশ্চয়। কিছু দেখ না, কিছু শুনো না। বেনটন বেরিয়ে যেতেই ব্লানশ ঘণ্টা বাজাল।

ব্লানশের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জুলি দেখল ওর দেওয়ালের আড়ালের আলমারিটা খোলা। ভেতরে ইস্পাতের খুপরিতে দুটো শক্তিশালী বাল্ব জ্বলছে। জুলি দেখল ভেতরে সারি সারি ফারকোট ঝুলছে। ও একটা কার কতদিন মনে মনে চেয়েছে। কতদিন লোভার্ত চোখে ঘণ্টার পর ঘন্টা ওয়েস্ট এন্ডের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ও ফার দেখেছে। এখানে চিঞ্চিলা, সিল্ক, বীভার, সেবল, সাদা শেয়ালের চামড়ার জামা আর আর্মাইন ঝুলছে। আলমারীর অন্য দিকে ইস্পাতের দেওয়াল আলমারী দেখে জুলি বুঝল ওটা নিশ্চয় গয়নার আলমারী।

ব্লানশ ড্রেসিং টেবিলে বসে ফিনফিনে মোজা পরছিল। মুখ তুলে ও জুলির দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, লন্ডনের প্রত্যেকটা চোর আমার ফার চুরি করা নিয়ে কথা বলে। কিন্তু ওরা তা পারবেনা, কারণ যত আলমারী এ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে ওটা সবচেয়ে নিখুঁত, ওটা খোলা সকলের অসাধ্য। আমার স্বামী ওটা তৈরী করেছেন। ঠিক মনে নেই এ পর্যন্ত ছ জন বা আটজন চোর ওটা ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ওরা আর চেষ্টা করবে না। যে ওই আলমারীতে হাত দেবে, তখনি কেনসিংটন পুলিশ স্টেশনে ঘণ্টা বেজে উঠবে, দু মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে পড়বে।

জুলি মনে মনে ভাবল, এটার জন্যই তাহলে হ্যারির আগ্রহ। ওই জন্তুটার কি শিক্ষাই না হবে, ফারগুলো চুরি করতে এলে।

ব্লানশ বলল, শুধু আমি আর মিঃ ওয়েসলি জানি কেমন করে ওটা খুলতে হয়, কোথায় ওর চাবি।

জুলি ইচ্ছে করে কথার প্রসঙ্গ পাল্টালো যেন আলমারীটার ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহই নেই। বলল, আমি কি কিছু করতে পারি ম্যাডাম?

–আমি এই সপ্তার শেষটা বাইরে থাকছি। মিঃ ওয়েসলি সোমবারের আগে ফিরছেন না। আমি জিনিষের ফর্দ করে লিখে রেখেছি। তুমি জিনিষগুলো গুছিয়ে দাও।

গতবার বাক্স গোছানোর কথা জুলির মনে আছে। হয়ত এবারও ঐরকম করবে। জুলি ফর্দ অনুযায়ী জিনিষপত্র গোছাল, কিন্তু ব্লানশ কিছু বলল না। তবু জুলি ওর অন্য বদমাইশির আশায় অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ ও বলে উঠল, জুলি এ ছুটিটা কি করবে?

জুলি হঠাৎ এই প্রশ্নে আমতা আমতা করে বলল, জানি না ম্যাডাম।

কুঁড়েমি কোরনা। দেখবে অনেক সেলাই করার আছে, রুপোর জিনিষগুলো সাফ করবে। কাজ নিয়ে থেকো। আমায় যেন বলে দিতে হয়না, কি করবে। ফুল সাজিও, আমার জুতোগুলো পরিষ্কার কোর। চারদিকে তাকালেই দেখবে অনেক কাজ আছে।

–হ্যাঁ, ম্যাডাম।

রবিবার তুমি বেরোতে পার, কিন্তু বাড়িটা ফাঁকা থাক এটা আমার পছন্দ নয়। বুঝেছো? দোহাই তোমার কোন উটকো পুরুষ মানুষকে বাড়িতে ঢুকিও না। তোমাদের মত মেয়েদের আমি চিনি। বাড়ির দারোয়ান জানে তুমি একা থাকবে।

জুলির মুখ-চোখ গরম হয়ে গেল।

ব্লানশ ভুরু কুঁচকে বলল, মেজাজ খারাপ কোরনা। আমি বলছি না তুমি বাড়িতে পুরুষ ঢোকাবে, যদি ঢোকাও তো আমি সহ্য করব না। এদিকে এস।

জুলি এগিয়ে গেল। ওর মুখে ক্ষোভ, বিদ্রোহ।

ব্লানশ ওর শুকনো কাঠির মত আঙুলগুলো দিয়ে জুলির গাল ছুঁলো, জুলি শিউরে পিছিয়ে গেল। ব্লানশ বলল, কি ভালো ফিগার তোমার, কি সুন্দর চামড়া। আমায় ভয় পেও না। ব্লানশের চোখ ঝকঝক করে উঠলো, ভয় পাও না তো আমাকে?

না, ম্যাডাম। জুলির গলায় অস্বস্তি।

ব্লানশ হেসে বলল, ঠিক আছে। কেউ কেউ আমায় ভয় পায়, কিন্তু কোন মানে হয়? আমি প্রত্যেকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি। মাঝে মাঝে একটু তামাসা করি, সে শুধু মজা করে। তারপর জুলিকে খুব তীক্ষ্ণ নজরে দেখে বলল, কাবার্ডের সামনের সেই মানুষটা দেখে ভয় পেয়েছিলে?

–বেশী না। জুলির গলায় আগ্রহ নেই।

–পাওনি? নীল ফুলের মতো চোখদুটো কঠিন হয়ে উঠল।

অন্য একটা চাকরানীর হিস্টিরিয়া হয়েছিল। সে যা মজা! আর সাপটা? দেখে চমকাওনি? হেসে উঠে বলল, সাপটা নিয়ে রগড় করতে আমি ভালবাসি। আমার স্বামী ওটাকে ঘেন্না করে। ওর বিছানায় মাঝে মাঝে ওটাকে ফেলে রাখি।

জুলি মুখটা ঘুরিয়ে নিল। ওর মুখের ঘৃণা ব্লানশকে দেখাতে চাইল না। ওর ইচ্ছে করল, ব্লানশকে ধরে ঝাঁকি মারতে।

জুলি তুমি কি ফার ভালবাস? ব্লানশ মেকাপ শেষ করতে করতে অতর্কিতে জিজ্ঞেস করল।

জুলি মনে মনে ঠিক করল, তুমি আর আমায় ফাঁদে ফেলতে পারছনা। মুখে বলল, হ্যাঁ ম্যাডাম, হয়ত ভালবাসি।

–আমার ফারগুলো দেখা ছোঁও ওগুলো জুলি। আমি চাই তুমি ওগুলো ছুঁয়ে দেখ, ভালবাস। জুলি নড়ল না।

ধন্যবাদ ম্যাডাম। অন্যের ফারে আমার কোন আগ্রহ নেই।

ব্লানশ কৌতুকে হেসে উঠল, বাজে কথা। দেখ ওগুলো। একটি মেয়েও নেই যে ওগুলো পাবার জন্যে চোখ অবধি উপড়ে দিতে চাইবেনা। এই সিল্কের কোটটার দাম পাঁচ হাজার পাউন্ড, সাদা শেয়ালের গায়ের ফারটা...আমি দাম বলতে চাই না। যাও না ভেতরে। দেখ ওগুলো।

জুলি আলমারীর কাছে গেল। ফারগুলো খুব সুন্দর। কিন্তু ও কোন আগ্রহ দেখাল না।

ব্লানশ বলল, সিল্ক কোটটা হ্যাঁঙার থেকে নামাও। গায়ে দিয়ে দেখতে পারো ইচ্ছে হলে।

জুলি আলমারিতে ঢুকে সিল্ক কোটটার গায়ে হাত দিতে গেল। হঠাৎ সুইল করে শব্দ করে, ইস্পাতের দেওয়ালগুলো বাতাসের ঝাপটা মেরে জুলিকে বন্ধ করে ফেলল।

এক মুহূর্ত জুলি এমনই হতভম্ব হয়ে গেল যে একটুও নড়তে বা কোন কিছু ভাবতে পারলো না। জুলি নিজেকে সামলালো।

ভাবল, এত সেধে ডেকে আনল। বোঝা উচিত ছিল ও কোন মতলব ভাজছে। ওকে ট্রেন ধরতে হবে, আমাকে বেশীক্ষণ পুরে রাখতে পারবেনা। কিন্তু আর একটু নড়াচড়ার জায়গা থাকলে ভাল হতো। এখানে বাতাসও বেশী নেই, আর এই জঘন্য ফারগুলোর গরমে কষ্ট হতে লাগল। ও যদি আমার প্রাণটাকে খাঁচা ছাড়া করতে চায় আমি তা হতে দেব না। আমি মাথা ঠাণ্ডা করে বসে থাকবো যতক্ষণ না আমাকে বের করে দেয়।

ভয়টা শাসনে রেখে জুলি আলমারীটার মেঝেতে বসে পড়ল। ফার কোটগুলো ওর মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে।

তারপর ওর ভাবনা এলো, যদি ঐ মাথা খারাপ মহিলাটা আমাকে এখানে রেখে সত্যিই চলে যায়, আমি তো এই কম বাতাসে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারবো না। এখনই নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ আলো দুটো নিভে গেল। তপ্ত, শাসরোধকারী অন্ধকার ওকে ঘিরে ধরল।

জুলি উঠে দাঁড়াল। ও বুঝতে পারল ও কাঁপছে। বন্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হল এই শ্বাসরোধী ভয়ঙ্কর অন্ধকারে যেন ওকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে।

মাথা গোলমাল হয়ে গেল ওর। বন্য চীকারে ফেটে পড়ে ও ইস্পাতের দেওয়ালে ঘুষি, লাথি মারতে লাগল, আঁচড়াতে লাগলো। চারদিকের ফারগুলো যেন চেপে জড়িয়ে ধরতে

চাইছে ওকে। ঘুষি মারতে মারতে হাতগুলো যেন অকেজো রবারের হাতুড়ির মত হয়ে গেছে। ক্রমশঃ শ্বাসরোধী অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগল ও। আর্তনাদ করতে লাগল। ওর অস্থির ছটফটানিতে একটা ফারকোট হ্যাঁঙার থেকে খুলে পড়ে ওকে চাপা দিল।

.

গাঢ় অথচ অস্বস্তিভরা ঘুম থেকে ধীরে জেগে ওঠার মতো করে জুলির চেতনা ফিরে এল। ওপর দিকে চেয়ে ও অনেকক্ষণ কাঁদল। কেন যে কাদল ও নিজেও জানেনা। বোধহয় ভীষণ ভয় পেয়েছিল, এখনও ওর স্নায়ুগুলোকে শাসনে আনতে পারেনি বলে এই কান্না।

তারপর আর কাঁদতে পারল না। তখন ওর মনে হল কে ওকে বিছানায় নিয়ে এলো! হিউ বেনটনের স্পর্শের কথা মনে হতেই ওর গা শিউরে উঠল বিতৃষ্ণায়।

ও ভাবল, আর নয়, আমি আর থাকবনা। ব্লানশ পাগল, বিপজ্জনকও বটে, আমি মরে যেতেও পারতাম।

বিছানা ছেড়ে উঠে ও ব্লানশের ঘরে গেল। মনে হল, ব্লানশ যেন ঘরেই আছে। কিন্তু না, ব্লানশ চলে গেছে। বিরাট, বিলাসবহুল কামরাটা অস্বাভাবিক ফাঁকা লাগছে ব্লানশ নেই বলে। বাতাসে ল্যাভেন্ডার আর চুরুটের ক্ষীণ গন্ধে জুলি শিউরে উঠে বুঝল তাহলে বেনটন এসেছিল।

বিছানার পাশের কাবার্ড থেকে এক বোতল ব্রান্ডি আর একটা গ্লাস বের করল। বিছানায় আরাম করে বসে খানিকটা ব্রান্ডি খেয়ে অচৈতন্য ভাবটা কেটে গেল।

জুলি ভাবল, আর থাকছি না। আজই জিনিষপত্র গোছগাছ করে রাতে চলে যাবো। আমি যতই সমঝে চলি না কেন ও আমায় ফাঁদে ফেলবেই। হ্যারি যাই বলুক, যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে।

জুলির চলে যাবার মুখ্য কারণ যতই ব্লানশ হোক, তবু ঐ দামী ফারকোটগুলোই ওকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। এখানে থাকা মানেই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। পুলিশ খোঁজ পাবে ও হিউয়ার্টের ওখানে কাজ করত, ওরা বুঝবে জুলি ছিল চোরদের সঙ্গী। সন্দেহ হবে চুরির সঙ্গে ওর যোগ আছে। না। ব্লানশ, ফারকোট কোন কিছুর সংস্পর্শেই ও থাকবে না।

হঠাৎ ফ্ল্যাটের কোথায় যেন একটা টেলিফোন বাজল। হাত বাড়িয়ে ও রিসিভার তুলল।

জুলি?

–হ্যাঁ। তুমি কোথায় হ্যারি? আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। তুমি ফোন করেছ বলে আমি খুব খুশী। আশ্চর্য! ঠিক যখন তোমার কথা ভাবছিলাম!

কি হয়েছে? হ্যারি তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল।

–তোমার সঙ্গে দেখা করব হ্যারি। জুলি একেবারে ভেঙে পড়ল, তুমি যতই ব্যস্ত থাক, আমার তোমার সঙ্গে দেখা করা ভীষণ জরুরী। আমি তোমায় দেখতে চাই হ্যারি।

–ঠিক আছে, ঠিক আছে, উত্তেজিত হয়ো না। একঘণ্টার মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। তুমি বেরোতে পারবে?

–মেয়েছেলেটা দুদিনের জন্যে বাইরে গেছে। ওঃ হ্যারি! তোমার গলা শুনেও ভালো লাগছে। ওর একটা কথা মনে হলো, হ্যারি তুমি এখানে চলে এসো। এখানে আমি ছাড়া কেউ নেই। বাড়িটাও দেখতে পারবে। তাও তত চাও তুমি, তাই না?

–টেলিফোনে এসব কথা থাক। কেউ আসবে না তো? হ্যারি প্রশ্ন করল।

না কেউ আসবে না। মিঃ, ওয়েসলি সোমবার রাতের আগে আসবে না। বিছানার পাশের ঘড়িটা দেখে জুলি বলল, সাড়ে চারটে বাজে। তুমি কখন আসবে?

ছটা। হয়ত সওয়া ছটা।

–হ্যারি, সাবধানে ঢুকো। দারোয়ান বাড়ির ওপর নজর রেখেছে।

লাইনের অপরপ্রান্তে খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হ্যারি বলল, হয়তো আমি না এলেই ভালো। এত ঝামেলা করার পর জিনিষটা কেঁচিয়ে দিতে চাই না।

–তোমায় আসতেই হবে। ওপর তলায় চলে যাবে লিফট নিয়ে, হেঁটে নামবে। ওপর তলায় মিসেস গ্রেগরী থাকেন, তুমি ভান কর ওর কাছে যাচ্ছে।

চালাক হয়ে গেছ তুমি। হ্যারি হাসতে হাসতে বলল, ঠিক আছে যাবো।

–তোমায় আবার দেখব ভেবে ভাল লাগছে।

কিন্তু হ্যারি ফোন ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে, জুলি যে এখানে থাকবে না শুনে হ্যারি কি বলবে ভেবে জুলি চিন্তিত হলো। হঠাৎ ওর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। ব্লানশের পোশাকের আলমারীর দিকে ছুটে গেল ও।

মনে মনে খুশী হয়ে ভাবল, আমি ওকে খুব চমকে দেব। আমাকে এত সুন্দর দেখাবে যে, ও আমার কথা ঠেলতে পারবে না।

ব্লানশের অজস্র পোষাক থেকে ইভনিং গাউনটা বেছে নিল। যে গাউনটা ও বাছল সেটা পপি ফুলের মতো রং, গলাটা নিচু কাটা, চওড়া ঘের দেওয়া স্কার্ট। জুলি ওর ঘন, গাঢ়, বাদামী চুল কাঁধ অব্দি আঁচড়ে ছটার মধ্যেই তৈরী হয়ে গেল।

আয়নায় নিজেকে দেখে ভাবল, ওকে এত সুন্দরী দেখাচ্ছে যে ডানা ওর পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারবে না। জুলি বয়সে অনেক তরুণ, মুখে সারল্য, অনেক বেশী চিত্তহারিণী। আর পোষাকটা পরে ও এখন অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যা অন্য পোশাকে কখনও হয়নি। জুলির নিজেকে চিনতেও ভুল হচ্ছে।

ছটার একটু পরে দরজায় ঘণ্টা বাজল। দরজা খুলে দেখল টুপিটা বাঁকা কায়দায় নামিয়ে ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হ্যারি দাঁড়িয়ে ওর সামনে। এক লহমায় ও জুলিকে

চিনতেই পারল না। তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো, বিহ্বল হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ।

জুলি! এই ধারকরা পোষাকে তোমায় দারুণ দেখাচ্ছে। আমি তো একেবারে ভিরমি খেয়ে গেছি। সেকথা সত্যি। হ্যারি জুলিকে চিনতে পারছিল না। হ্যারি ভাবল, ওঃ। অপূর্ব দেখতে ওকে! একেবারে কোহিনুর? আর আমি সে কথা জানতামই না।

জুলিকে জড়িয়ে ধরল ও, জুলি হাত ছাড়িয়ে বলল, আমাকে ছুঁয়োনা। আমার পোষাক লাট খেয়ে যাবে।

জুলির চোখের কঠিন দৃষ্টি দেখে হ্যারি চমকে গেল। থতমত খেয়ে গেল। জুলির দিকে হাঁ করে চেয়ে বলল, জুলি তুমি অসাধারণ! সিন্ডারেলা তোমার কাছে কিছুই নয়। তোমায় দেখে তো আমার মাথা ঘুরছে। এটা সেই মেয়েছেলেটার পোশাক?

নিশ্চয়ই। তুমি নিশ্চয় ভাবতে পারো না যে এ পোষাকটা আমি কিনতে পারি। নাকি তাই ভাবো? কিন্তু তুমি ভেতরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এসো।

হ্যারি ওর পেছনে লাউঞ্জে ঢুকল। জীবনে এই প্রথম ও একটা কেমন অসুবিধে বোধ করছে। জুলির সৌন্দর্য আর বাড়ির পরিবেশ ওর আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছে। জুলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হ্যারি বুঝল ও জুলির প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে ও কিভাবে খাপ খাওয়াবে ভেবে পেল না।

জুলিও বুঝল ওর সৌন্দর্য হ্যারির মনে কি রকম প্রভাব ফেলেছে। ফায়ার-প্লেসের সামনে স্থির, অবিচল দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে চেয়ে থেকে ও হ্যারির এই অবস্থাটাকে নিজের কাজে লাগাতে চাইল।

–কি ব্যাপার জুলি! তুমি আমাকে একটা চুমোও দেবে না?

না। জুলি কাটা কাটা গলায় বলল, আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দেব। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

–কেন, কি ব্যাপার জুলি? হয়েছেটা কি?

জুলি ব্লানশের ভয় দেখানোর সমস্ত ঘটনা বলল।

জুলির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখে হ্যারি হতাশ হলো। বলল, শোন জুলি, অত উত্তেজিত হয়ো

–ওকে ভয় করে আমার।

সোফায় গিয়ে বসল হ্যারি। হ্যারি ঠিক করলো জুলিকে একাজে বহাল রাখতে হলে ওকে কেন এখানে রাখা হয়েছে খুলে বলতে হবে।

অস্থিরভাবে সিগারেট ধরিয়ে বলল, জুলি আজ জানলেও জানবে, কাল জানলেও জানবে। আমি ঐ ফারগুলো চাই। তুমি তা বুঝেছ, বোঝনি?

–তুমি কি আমাকে হাঁদা ভেবেছো নাকি? নিশ্চয়ই বুঝেছি। আমার ভাল লাগছে না।

–তোমার কোন চিন্তা নেই, তুমি নিরাপদেই থাকবে। তোমার কাজ খালি আলমারীটা কি করে খোলে জেনে নাও। শহরে এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ঠিক করেছি আলমারিটা ভাঙব। তোমার সাহায্য চাই। তুমিই একমাত্র লোক যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

জুলি সংক্ষেপে বলল, ওটা তুমি ভাঙতে পারবেনা। ব্লানশের থেকে জেনেছি আলমারীটার সঙ্গে কেনসিংটন পুলিস স্টেশনের যোগাযোগ আছে।

হ্যারি সামনে এগিয়ে বসল, এইতো। এ সব খবরের অপেক্ষাতেই তো ছিলাম। আমি জানতে চাই, ও আর কি বলেছে?

বলেছে, আটজন চোর ওটা খুলতে গিয়ে ধরা পড়েছে। কেমন ব্যাপারটা?

–চারজন, আটজন নয়। আমি ভেবেছিলাম ওই জন্যেই ধরা পড়েছে সবাই, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। দেখছনা সোনা? তুমি যদি লেগে থাকতে পার, তাহলে আমায় সব দরকারী খোঁজ খবর দিতে পার। ফারগুলোর কথা বল।

–একটা সিল্ক কোট আছে। ও বলল, সেটার দাম পাঁচ হাজার পাউন্ড। জুলি চোখ কোঁচকাল। ফারগুলোর কথা ভুলতে পারছেনা ও। ওগুলো দেখার পর থেকেই ওর পেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলল, একটা সাদা মেরু শেয়ালের ফার, অপূর্ব দেখতে। ওই পিশাচীটার পক্ষে খুব বেশী ভাল। তাছাড়া বীভার, চিঞ্চিলা, আর্মাইন, সেবল।

–কোনও গয়নাগাটি দেখলে?

না। তবে আমি জানি ওই আলমারীর ভেতর একটা ইস্পাতের সিন্দুকে গয়না আছে।

ওকে প্রশ্ন করতে করতে হ্যারি ভাবছিল কেমন করে জুলিকে এখানে থাকতে রাজি করানো যায়। জুলির কোন দুর্বলতার কথা জানতে হবে, যাতে ঘা মেরে ওকে যেমন করেই হোক রাজি করাতেই হবে।

–তুমি বললে তুমি ভেতরে ঢুকতেই আলমারীটা বন্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বন্ধ হলো না আস্তে?

জুলি শিউরে উঠে বলল, ইঁদুর ধরার কলের মত দুম করে। দরজা একবার বন্ধ হলে, ভেতরে। কোন হাওয়া নেই তুমি দম বন্ধ হয়ে মরবে।

বন্ধ যাতে না থাকতে হয়, সেই চেষ্টাই করতে হবে। ব্লানশ কি দরজা বন্ধ করে দেয় না ওটা আপনা থেকেই বন্ধ হলো?

ব্লানশ তো ধারে কাছেই ছিল না। সত্যি বলছি আমি জানি না।

–বেশ দেখা যাক, আমাকে ওর শোবার ঘরে নিয়ে চলো।

–বেশ। দেখতে চাও তো দেখ, ভাল করে দেখ, তবে আমার সাহায্যে দেখা-টেখা হবে না। আমি এ সবের মধ্যে আর থাকছিনা।

আরো হতাশ, অসহায় হ্যারি ওর পেছন পেছন ব্লানশের ঘরে গেল। জুলির এই কাজ ছেড়ে দেবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হ্যারিকে যেন হারিয়ে দিচ্ছে।

জুলি ওকে লেপ ঢাকা দেওয়াল দেখাল।

–ওর পেছনে। ওটা ছুঁয়োনা। আমরা চাই না এখুনি পুলিশ এসে পড়ুক।

–ঠিক বলেছ। আমরা চাই না। হ্যারি একটু অস্বস্তির সঙ্গে দেওয়ালটা খুঁটিয়ে দেখার পর বলল, কোথাও কোন চিহ্নই নেই। নিখুঁত কাজ। দরজার পাল্লা কি বাইরের দিকে খুলে যায়, না পাশে সরে যায়?

পাশে সরে গিয়েছিল।

দেওয়ালের দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে কয়েক মিনিট চেয়ে মাথা নাড়ল হ্যারি, না, কোন লাভ নেই। আমি হাত দেবার আগে আমাদের ভাল করে জেনে নিতে হবে কি করে খোলে আলমারীটা। তোমাকেই জানতে হবে জুলি।

জুলি ওর অস্বস্তি টের পেয়ে বলল, আমি পারবো না, তোমাকে তো বলেইছি, আমি থাকতে পারবো না।

হ্যারি ওকে কাছে টেনে নিল।

–আরেকটু লেগে থাক জুলি। আমি তোমাকে পঞ্চাশের বদলে একশো পাউন্ড দেব। জুলি, প্লিজ, আরেকটু সাহস তোমাকে দেখাতেই হবে। তুমি তো এ পর্যন্ত চমৎকার চালালে।

জুলি মুখ তুলল। ওর পুরুষ্টু ঠোঁট হ্যারির ঠোঁটের নাগালে।

না হ্যারি। যথেষ্ট হয়েছে আমার। দেখ আমি তোমার প্ল্যান সব শুনেছি। ফলে এ কাজে আমি তোমার বিপক্ষ হলাম। আমি পুলিশের ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাই না। তাছাড়া ঐ মেয়েছেলেটাকে আমি কত ভয় পাই তুমি জানো। আমি ওকে সহ্য করতে পারছি না।

হ্যারির মনে একটা কথা তড়িৎ গতিতে খেলে গেল। হ্যারি উপলব্ধি করল এ মেয়েটির মূল্য ওর জীবনে কতখানি। ও মনে মনে ভাবল, কথাটা ভোলাখুলি বলে ফেলাই ভাল। ও আমায় কাত করে ফেলেছে, আমি ওকে হারাতে চাই না। ওর মতো আমার জীবনে কেউ আসেনি। ওকে যদি বিয়েও করতে হয় করব। চুলোয় যাক্ সব, আমি তাই চাই।

জুলির হাত ধরে হ্যারি বলল, তুমি কি একটু বেশী বেশী দেখাচ্ছো না জুলি? আর দু-তিন দিনের মধ্যেই তো কাজ ফতে হয়ে যাবে। তারপর আমরা বিয়ে করে ফেলব, কেমন লাগবে তোমার?

জুলির দিকে সাগ্রহে চেয়ে ওর আরো কাছে গিয়ে বলল, বাকী জীবনটা আরামে থাকার মত প্রচুর পয়সা থাকবে আমার হাতে। আমরা আমেরিকায় চলে যেতে পারি। মনের সুখে থাকতে পারি।

জুলি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ওর মুখের দিকে চাইল। এ একেবারে আশাতীত। ওর শিরদাঁড়া দিয়ে উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল।

বিয়ে করবে আমাকে? আমেরিকা নিয়ে যাবে?

–কেন করবনা? তুমি আনন্দ চাও, চাও না? হ্যারি উত্তেজিত হয়ে উঠল, আমি তোমাকে আনন্দ দেব। সমস্ত পৃথিবীটা থালায় সাজিয়ে তোমায় উপহার দেব। তুমি বুঝছ না সোনা, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি তোমার জন্যে পাগল হয়ে গেছি।

–যদি মিথ্যেমিথ্যে বল..., জুলির চোখ চক্ করে উঠল।

নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছিনা। সত্যি বলছি জুলি। তুমি যদি এ কাজটা ছেড়ে দাও কি হবে তোমার? কোথায় যাবে তুমি? ধর আমাকে ছেড়ে গেলে, কোথায় যাবে তুমি? হিউয়ার্টের কাছে? সে তোমায় আর নেবে না। কারখানায় হপ্তায় চার পাউন্ডের চাকরি করতে তোমার আর ভাল লাগবে? আমি তো তোমায় যা যা চাও সব দিতে চাইছি–পোষাক, টাকা, মজা, যদি আমাকে চাও তো আমাকেও। জাহান্নামে যাক সব, এর চেয়ে বেশী কিছু তো আমার দেবার নেই। আমেরিকায় আমার কিছু বন্ধু আছে, আমরা মহাশূর্তিতে কাটাবো বাকী দিনগুলো। কি বলল?

ওকে একটু চেয়ে দেখল জুলি। এইতো ওর জয়ের মুহূর্ত। হ্যারির মনের কথাটি মুখে এসেছে। হ্যারি ওকে ভালবাসে। এখন জুলিকে সতর্ক হয়ে চাল চালতে হবে, যাতে কোন বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ও হ্যারির থেকে যা ইচ্ছে তাই আদায় করতে পারে।

হ্যারির গলা জড়িয়ে ধরল জুলি। বলল, আমিও তোমাকে ভালবাসি হ্যারি। কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি চোর নই। স্বীকার করছি, যা আমার করা উচিত নয় তেমন কাজ আমি করেছি, তবে আইন বাঁচিয়ে। আমি কোনদিন এমন কাজ করিনি বা করবো না, যাতে আমাকে জেলে যেতে হয়। হ্যারি দোহাই, তুমি এ কাজ ছেড়ে দাও। আমি জানি তুমি ধরা পড়বেই। ব্লানশ পিশাচের মতোই ধূর্ত। তুমি ধরা পড়লে আমার কি হবে?

হ্যারি জুলিকে কাছে টেনে নিল।

হ্যারি ভাবল, এখানেই খেলা ফুরিয়ে গেলে আমি কি করবো। যদি চোখ খোলা না রাখি তবে ওকে হারাবো। মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কোন উপায় ওকে বের করতেই হবে। তিনি এ কাজে অন্য মেয়ে খুঁজে বের করুন।

–বেশ জুলি, হ্যারি চুমো খেল, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তোমায় আমি জোর করে ধরে রাখতে তো পারবো না। তাতে আমাদের সম্পর্কের তফাৎ হবে না কিছু। আমি যে করে হোক ওই টিনের কৌটোটায় ঢোকার উপায় খুঁজে বের করবই। তবে তুমি চলে যাও। আমি তোমার জন্যে পাগল হয়ে গেছি সোনা। তোমায় ঠিকই দেখব।

–সত্যি হ্যারি। সত্যি বলছ?

–নিশ্চয়ই।

–কিন্তু কেন এ কাজ করছ হ্যারি? চল না আমেরিকায় চলে যাই দুজনে। এ ঝুঁকি নিও না হ্যারি।

হ্যারি একটু অধীর হয়ে বলল, আমাকে একাজ হাসিল করতেই হবে। তুমি ভাবছ কোথা থেকে টাকা আসবে? শোন জুলি, একাজটা করতে পারলে আমার ভাগে পাবো আট হাজার পাউন্ড। আমায় করতেই হবে।

আট হাজার পাউন্ড!

একটি মুহূর্ত ভাবল, ওর প্রলোভনে থেকে যায় এখানে, সাহায্য করে হ্যারিকে। তারপর হুঁশিয়ার হয়ে ভাবল, সে এ চিন্তাকে আমল দেবে না। হ্যারি নিশ্চয়ই একটা ফন্দী ঠাওরাবে ঠিকই। যারি ঠিক চালিয়ে নেবে। তারপর সে টাকা জুলির জন্যেই খরচ করবে। বেকার ঝক্কি পোয়াতে যাবে কেন?

–বেশ হ্যারি...জুলি বলতে শুরু করল।

–ওটা কি? হ্যারি শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে গেল, কিছু শুনতে পেলে?

জুলি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

না? কি বলছো তুমি?

চট করে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুলতেই, চটপট করে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ফ্ল্যাটে কেউ ঢুকেছে মনে হচ্ছে। হ্যারি ফিসফিসিয়ে বলল।

ব্লানশ!

জুলি অজ্ঞান হয়ে গেল প্রায়। ব্লানশের শোবার ঘরে, ওরই পোষাক পরা অবস্থায় ধরা পড়লে কি অবস্থাটাই হবে জুলির। ভয়ে জমে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্যাসেজ দিয়ে একজোড়া পা হেঁটে আসছে।

মিসেস ওয়েসলি? জুলির ভয়ে খাবি খাওয়ার অবস্থা। কি করব আমি। জানলার দিকে মিথ্যেই ছুটে গেল ও। আমাকে লুকোতেই হবে।

দরজা খুলে গেল। একটা তীব্র আর্তনাদ চেপে নিয়ে হাত মুঠো পাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জুলি। একটি লোক ঢুকল। কালো চশমা তার চোখে। দরজায় দাঁড়িয়ে কালো চশমা জোড়ার ভেতর দিয়ে সোজা জুলির মুখের দিকে চেয়ে আছে।

–কেউ আছে এখানে? লোকটি আস্তে বলল, ব্লানশ, তুমি আছো?

এখন তীব্র উদ্বেগ থেকে সহসা মুক্তির স্বস্তিতে বিভ্রান্ত হতে হতে জুলি বুঝল এ হাওয়ার্ড ওয়েসলি। ওয়েসলি ওকে দেখতে পাচ্ছেন না।

.

হাওয়ার্ড ওয়েসলি খুব একটা লম্বা মানুষ না হলেও জুলির মনে হল লোকটা বিশালদেহ। শক্তসমর্থ শরীর, চওড়া কাধ, সোজা হয়ে হাঁটেন। কালো চশমার ভেতর দিয়ে জুলি লক্ষ্য করল ওর চোখ-মুখ অতি সুশ্রী, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট, শক্ত চিবুক ওঁর শরীরের মধ্যে একটা কর্তৃত্বের আভিজাত্য এনে দিয়েছে। চওড়া কপালের ওপর অবাধ্য বাদামী চুলে সবে রগের কাছে পাক ধরেছে। পরে ও জেনে অবাক হয়েছিল যে, ওর বয়স মাত্র আটত্রিশ।

জুলি আর হ্যারি দুজনেই ওঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনি ঘরে ঢুকতে ওরা সরে দাঁড়াল।

ঘরে কেউ আছে কি? উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যারি জুলিকে হাত নেড়ে ইশারা করে এই পরিস্থিতিকে কি ভাবে সামলাতে হবে, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছে।

জুলি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, হা...আমি।

ওয়েসলি ওর দিকে মুখ তুলে এমনভাবে ভুরু কোচকালেন যেন আগাগোড়াই উনি জানতেন জুলি এখানে আছে।

–তুমি কে? প্যান্টের পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরালেন।

–আমি জুলি হল্যান্ড, নতুন চাকরানী। জুলি নিজের গলাকে সংযত শাসনে রাখার চেষ্টা করল।

–ওঃ। উনি পকেট হাতড়ালেন। কপালটা কুঁচকে গেল, বললেন, আমাকে একটু আগুন দিতে পারো। মনে হচ্ছে ওভারকোটের পকেটে আমি দেশলাই ফেলে এসেছি।

চারিদিকে উদ্ভ্রান্তের মত চাইল জুলি। হ্যারি পকেট থেকে লাইটারটা বের করে, টেবিলে রেখে, বুড়ো আঙুল দিয়ে ও ওয়েসলিকে দেখাল। হ্যারির না যাওয়া দেখে জুলি অবাক হল। ও স্থির, সতর্ক দৃষ্টিতে ওয়েসলিকে লক্ষ্য করছে।

হ্যারির এই ধীরভাব দেখে জুলি বিরক্ত হলো। জুলি কাঁপছে, থরথর করে, ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। লাইটারটা ছোঁ মেরে তুলে ও ওয়েসলির দিকে এগোল। ও আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল ওয়েসলি সেদিক পানেই তাকিয়ে আছে দেখে প্রমাণ হয়ে গেল যে, উনি সত্যিই অন্ধ। ওদের দেখতে পাননি।

লাইটারটা জ্বালাতে চেষ্টা করল জুলি। ওর আঙুল এত কাঁপছে যে ওটা পড়ে যাবার যোগাড় হল প্রায়।

–আমাকে দাও। ওয়েসলি হাত বাড়ালেন।

জুলি লাইটারটা দিল।

মিসেস ওয়েসলি কোথায়?

–উনি এই শনিবার বাইরে গেছেন স্যার। জুলি হ্যারির দিকে তাকাতে হ্যারি ওর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে, চোখ টিপে দরজার দিকে সরে গেল।

–আচ্ছা। ওয়েসলি সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা জুলিকে দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ।

জুলি লাইটার নিয়ে টেবিল রাখলো, হ্যারি ওটা তুলে নিল।

ওয়েসলি প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, কবে ফিরবেন বলেছেন?

সোমবারের আগে আপনি আসবেন বলে ভাবেন নি উনি। সোমবার নাগাদ ফিরবেন।

–তুমিও ভাবোনি আমি আসব? ওয়েসলি হাসলেন, তোমার সন্ধ্যেটা মাটি করে দিলাম না তো?

–না স্যার। জুলি সাব্যস্ত হয়ে বলল। মনে ভয় হল উনি আবার সন্দেহ করছেন না তো? –আমার কিছু করার ছিল না। ম্যাডামের ঘর পরিষ্কার করছিলাম।

করছিলে বুঝি? তোমার গায়ের সুবাসে আমার মনে হচ্ছে তুমি কোন পার্টিতে যাচ্ছ। একটু হেসে বললেন, আমি তোমাকে কোন কটু কথা বললাম না তো? তবে আজকাল আমায় নাক আর কানের ওপর নির্ভর করে চলতে হয় কিনা। ভারি সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তো!

জুলি লাল হয়ে গেল, পিছিয়ে এল দু–পা। সুন্দর সুগন্ধিই তো হবার কথা। ব্লানশের সুগন্ধি

ও তোতলামি করে বলল, আ–আমি বেরোচ্ছিলাম না।

ওয়েসলি বললেন, মিঃ গেরিজ মালপত্র দেখছেন। উনি আমার সেক্রেটারী। এখনি ওপরে আসবেন। তুমি আমাদের কফি খাওয়াতে পারবে?

–হ্যাঁ স্যার। জুলি ভাবল এখনি এই পোষাক ছাড়তে হবে।

–তাড়াতাড়ি কফি দিও। আমার কাজ আছে। ওয়েসলি মাথা ঘোরাল, মনে হল উনি হ্যারির দিকে সটান চাইলেন। হ্যারি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল। ওয়েসলি বলল, আমার কেবলি মনে হচ্ছে, এ-ঘরে আরো কেউ আছে। আছে কি? ওয়েসলি দরজার হাতলটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন।

হ্যারি ওয়েসলির হাতের কাছেই এসে গেল। জুলি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওকে সরে যেতে বলল ইশারা করে।

না স্যার, কেউ নেই।

ওয়েসলি ভুরু কোঁচকালেন, আমার এমনি মনে হল। ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি পার কফি বানাও। উনি বেরিয়ে গেলেন।

উনি চলে যেতেই হ্যারি ফিসফিস করে বলল, ও। খুব বাঁচান বেঁচেছি। পোশাকটা ছাড়। আরেকটা লোক তোমায় যেন এ পোশাকে না দেখে ফেলে।

–আমার দোষ নেই, আমি জানতাম না উনি আসবেন। জুলির কেঁদে ফেলার যোগাড়।

–সে থাকগে! তাড়াতাড়ি পোশাকটা ছেড়ে ফেল।

ব্লানশের আলমারী থেকে ইউনিফর্ম বের করে, ছুটে সেটা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে পোশাক পাল্টে এলো।

ও যখন ফিরে এল, হ্যারি তখন কান পেতে কি যেন শুনছে। ও তাড়াতাড়ি ফিসফিস্ করে বলল, ওদের কফি দাও। আমি বেরিয়ে যেতে চাই।

জুলি রুদ্ধশ্বাসে বলল, আবার কবে আমাদের দেখা হবে? আমি আর এখানে থাকব না। এরপরে তো নয়ই।

কাল বিকেল অব্দি থাকো। আমি ঠিক তিনটের সময় উল্টো দিকের পার্কে থাকব। কেটে পড়ো। এখন যাও। কাল কথা হবে। আমি এখন যেতে চাই।

জুলি এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল।

–ঠিক আছে। তবে আমাকে জোরাজুরি করে লাভ হবে না। আমি এখানে থাকব না। জুলি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে গেল।

ও যখন কফি নিয়ে ফিরে এলো ওয়েসলি তখন ইজিচেয়ারে বসে চুরুট খাচ্ছেন। একটি যুবক টেবিলে বসে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। বয়সে জুলির চেয়ে সামান্য বড় হবে। ওর পাতলা, কুশ্রী মুখখানা জুলিকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জুলি অনুমান করল ইনিই

নিশ্চয়ই ওয়েসলির সেক্রেটারী, গেরিজ। ওয়েসলির কাছেই একটা টেবিল দেখিয়ে দিয়ে ও আবার কাজ করতে লাগল।

জুলি নীচু হয়ে ট্রে-টা রাখতে ওয়েসলি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিশ্চয়ই সদ্য এসেছ?

কাল এসেছি স্যার।

সংশয়ভরা গলায় ওয়েসলি বললেন, আশা করি এখানে তোমার ভাল লাগবে। আমরা এত তাড়াতাড়ি ফিরব ঠিক ছিলনা, তা তোমার যদি এই শনি-রবিবার কোথাও যাবার থাকে, আমাদের জন্যে নষ্ট কোর না। আমাদের কিছু লাগবে না। আমরা শনিরবিবারটা কারখানায় থাকব। কালকে ব্রেকফাস্ট দেবার জন্য বিরক্ত করব, শুধু। বুঝলে? রেস্টুরেন্টে অর্ডার দিয়ে দিতে পার। সকাল নটার মধ্যে আমরা বেরোব, তুমি সাড়ে আটটার মধ্যে দিলেই হবে, কেমন?

–ঠিক আছে স্যার। জুলি জবাব দিল।

ব্লানশের শোবার ঘরে যেতে যেতে ভাবল, উনি খুব ভাল, দয়ালু মানুষ। অন্ধ হওয়া কি অভিশাপ? ব্লানশের মতো পিশাচী, জানোয়ারটাকে কি দেখে উনি বিয়ে করলেন?

ব্লানশের ঘর গোছানো হয়ে গেলে ও রান্নাঘরে গেল। কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না ও। এখনো হাতে অনেক সময় আছে। বেরোতে পারলে ভাল হতো কিন্তু একা একা ঘুরতে ভাল লাগে না। পায়চারি করতে করতে জুলি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল।

হ্যারির কথা মনে এলো। ওয়েসলি আসার আগে হ্যারির সঙ্গে আমেরিকা যাবার কথা ভাবতে ওর রোমাঞ্চ অনুভব হচ্ছিল, কিন্তু এখন যেন তেমন লাগছে না। মনে মনে ওয়েসলির সঙ্গে হ্যারির তুলনা করতে লাগল। এ যেন নকল হীরের সঙ্গে আসল হীরের তুলনা। ওর হঠাৎ মনে হল হ্যারি চরিত্রহীন, হ্যারির পোশাক-আশাক রং-চঙে, কু-রুচি সম্পন্ন। ওয়েসলি ধনী, আভিজাত্য তার চোখে মুখে। হ্যারি জীবনেও ওঁর মত ধনী হবে না। হ্যারি ফারগুলো চুরি করে আট হাজার পাউন্ডের মাল্লিক হয়ে কতদিন থাকবে? আমেরিকা গিয়ে মনের সুখে টাকা ওড়ালে বেশীদিন থাকবে না টাকা। তখন কি হবে?

ও নিজের মনেই স্বীকার করল, হ্যারি একটি ভাল চোর। ডসন ওকে হ্যারির কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিল। হিউয়ার্ট ওকে ঘেন্না করে। ঐ জঘন্য মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে হ্যারির কারবার চলে। তারপর ঐ ডানা মেয়েটা। হ্যারিকে বিয়ে করে আমি কটা ঝামেলা ডেকে আনব?

বিয়ে যদি করতে হয় তবে ওয়েসলির মত লোককেই বিয়ে করা উচিত। জুলি যা যা চায়, গাড়ি, বাড়ি, পোষাক, দাস–দাসী সব। তবে হ্যাঁ, ওয়েসলি ওকে চেয়েও দেখবে না। তাছাড়া ওঁর তো বিয়ে হয়ে গেছে।

যদি জুলি ওঁকে চুরির কথা সব বলে দেয়? হয়ত জুলির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন উনি। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল জুলি। এসব কি ভাবছে ও। এরকম ভাবা ঠিক নয়। এতে বিপদ আছে। ওর মনে এল সেই মেয়েটির কথা যে সব কথা চাউর করে বেড়াত। তার কথা হিউয়ার্ট কি বলেছিল! এ-সব মনে আনা ঠিক নয়।

দরজায় আস্তে টোকা পড়তে ওর চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। গেরিজ কফির ট্রে হাতে ঢুকল।

–হ্যালো, মনে হল ট্রে-টা নিয়ে আসি। চমৎকার কফি খেলাম। গেরিজের মুখে সহৃদয় হাসি।

জুলি খুশী হয়ে গেরিজের হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে বলল, তোমাদের দরকার ছিল কফিটা।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে রান্নাঘরে ঘুরতে ঘুরতে যুবকটি বলল, আমি টম গেরিজ। আমি মিঃ ওয়েসলির সব কাজকর্ম দেখি। আমাদের আলাপ হলে খুব খুশী হবো। তুমি আমাকে এখানে ঘনঘমই দেখবে।

–দেখব বুঝি?

–হ্যাঁ। মিঃ ওয়েসলিকে বললাম তুমি দেখতে চমৎকার।

জুলি মুখ ফিরিয়ে কফির বাসনগুলো ঘোয়ার জায়গায় রাখতে লাগল।

আশা করি তুমি কিছু মনে করলে না। সত্যি কথা বলবে।

জুলি হাসল। না আমি কিছুই মনে করিনি। তবে আমার মনে হয় ওয়েসলি আমার সম্বন্ধে খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন।

গেরিজ ভরসা দিল, দেখিয়েছেন বই কি। মুখে না বললেও কান খাড়া করে শুনছিলেন।

জুলি হাসতে হাসতে বাসন ধুতে লাগল।

গেরিজ বলল, মিঃ ওয়েসলি এখন ডিক্টাফোনে কথা বলছেন। তাই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। কিছু মনে করনি তো?

–চমৎকার! এখানে থাকতে কেমন লাগছে?

–তেমন ভাল নয়, জুলি সত্যি কথা বলল।

মিসেস ওয়েসলি নিশ্চয় তামাসাগুলো করেছেন?

–হ্যাঁ।

–সেই নকল সাপ, আলমারীতে পুরে বন্ধ করে দেওয়া।

জুলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন করে জানলে?

–সকলের সঙ্গেই করেন। আমার সঙ্গেও এই বদরসিকতা করেছিলেন। আমি ঐ হতভাগা আলমারীতে দশ মিনিট বন্দী ছিলাম। ভেবেছিলাম মরে যাব।

জুলি দৃঢ়গলায় বলল, এখানে ঐ বিপজ্জনক মহিলার সঙ্গে আমার বেশীদিন থাকার ইচ্ছে নেই।

না না, থাক। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে দেখবে, মিসেস ওয়েসলি চমৎকার মহিলা। কিছুদিন বাদে উনি আর খোঁচাখুচি করবেন না। এই তো, এখন আমাকে আর বিরক্ত করেন না। তোমারও ওয়েসলিকে ভাল লাগবে।

জুলি হেলান দিয়ে দাঁড়াল। গেরিজের মুখ থেকে সমস্ত গল্প শোনার জন্যে ওর মন বেশ তৈরী।

ভদ্রলোক টাকা দিয়ে মহিলাকে বিদায় করে দেননা কেন?

–ওঁর টাকা নেই বলে। এখন পাইলটদের বদলে যে যন্ত্র দিয়ে প্লেন চালানো হয়, অর্ধেক সময়ে, অর্ধেক খরচে, সেটি তৈরী করবার জন্যে ওয়েসলি একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টার রিসার্চের জন্যে উনি কানাকড়িটিও লাগিয়ে বসে আছেন। মিসেস ওয়েসলি একথা খুব ভালভাবেই জানেন যে উনি কিছুতেই টাকাকড়ি দিয়ে বিদায় করে দিতে পারবেন না।

জুলি শুনে অবাক হয়ে বলল, কি ভয়ানক অবস্থা! তার ওপর আবার উনি অন্ধ।

–হ্যাঁ, গেরিজ মাথা নাড়ল, এ সপ্তাহে ওনার একটা বড় আশায় ঘা খেলেন উনি। একজন ফরাসী স্পেশালিস্ট ডাক্তার ওনাকে আশা দিয়েছিলেন, তিনি ওঁর চোখ অপারেশন করে ভাল করতে পারবেন। তাই আমরা প্যারিসে গিয়েছিলাম।

ঘড়ির দিকে চেয়ে শিস্ দিয়ে গেরিজ বলে উঠল, আমি যাই। বলেছিলাম শুধু পাঁচ মিনিট দেরি হবে। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

পরে, জুলি যখন শুয়ে পড়েছে কানে এল গেরিজ হেঁকে বলছে, গুডনাইট! চমকে উঠল ও, মনে ভাবল তাকেই ডেকে বলছে গেরিজ। গেরিজকে তার ভাল লেগেছে। তারপর বুঝল ও ওয়েসলির সঙ্গে কথা বলে চলে গেল। সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। জুলির হঠাৎ মনে হল এই ফ্ল্যাটে ও আর ওয়েসলি ছাড়া কেউ নেই।

ওয়েসলি লোকটা বেশ ভাল। জুলি ভাবল চিন্তার কিছু নেই। ওই জায়গায় যদি বেনটন থাকত আজ, তাহলে জুলি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত।

জুলির ঘুম এসে গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ কাঁচ ভাঙার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে যেতে ও লাফিয়ে ড্রেসিং গাউনটা চড়াল।

ওর ভয় হল ওয়েসলির হয়ত কোন দুর্ঘটনা হয়েছে। প্যাসেজ দিয়ে ওয়েসলির ঘরে কান পাততে ঘরে মানুষের নড়াচড়ার আওয়াজ পেল। ও ধাক্কা দিল।

–কে ওখানে? ওঃ! ভেতরে এস জুলি, ওয়েসলি বলল।

জুলি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখল পরনে ড্রেসিংগাউন ও পায়জামা পরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়েসলি। এখনো চোখে সেই ভারী, কালো চশমা। জুলির মনে হল ওটা তো খুলে ফেলতে পারেন। আর পায়ের কছে ভাঙাচোরা কাঁচের পাত্র ছড়ানো। কাপেটট ভিজে গেছে।

–হ্যালো জুলি! ওয়েসলির মুখে হাসি, আমাকে উদ্ধার করতে এসেছো?

–আমি শুনতে পেলাম...কথা বলতে গিয়ে ওয়েসলির হাত থেকে রক্ত পড়তে দেখে জুলি বলল, একি, আপনার হাত কেটে গেছে?

–হতভাগা পাত্রটা হাত থেকে পিছলে পড়ে গেল। পরিষ্কার করতে গিয়ে আঙুলে কাঁচের টুকরো বিধে গেল।

–আমি ব্যান্ডেজ নিয়ে আসছি। ওয়েসলিকে সাহায্য করতে পেরে জুলি মনে মনে খুশী হলো। তাড়াতাড়ি ব্লানশের বাথরুম থেকে ফাস্ট এইডের বাক্স নিয়ে এসে বলল, বসুন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ। চারদিক হাতড়িয়ে ওয়েসলি বিড়বিড় করে বললেন, আঃ, চেয়ারটা কোথায়? আমি সব কেমন গণ্ডগোল করে ফেলেছি।

জুলি ওর হাত ধরে ওকে চেয়ারের কাছে নিয়ে এল।

বসতে বসতে ওয়েসলি বললেন, এত অসহায় হওয়া বিশ্রী ব্যাপার। তুমি এসে না পড়লে কি যে করতাম, জানি না।

জুলি কি বলবে ভেবে পেল না। খানিকক্ষণ আড়ষ্টতার পর ওয়েসলির আঙুলের রক্তটা মুছিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। বলল, এর ওপর দিয়ে আঙুল ঢাকা পরিয়ে দিই, তাহলে আপনার কোন অসুবিধা হবেনা।

–খুব ভাল কথা। অনেক উপকার করলে। তুমি ঘুমিয়েছিলে নাকি?

না, একটা নরম চামড়ার আঙুল ঢাকা ব্যান্ডের ওপর দিয়ে পরাল জুলি, ওয়েসলির কব্জি ঘিরে টেপটা বাঁধল। জিজ্ঞেস করল, এতে একটু আরাম বোধ হচ্ছে কি?

–চমৎকার। ওয়েসলি আঙুলটা ভাজ করে মুড়ে দেখলেন। বললেন, জায়গাটা আমি কি ভয়ানক নোংরা করে ফেলেছি।

–না, না। ঠিক আছে, আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি।

জুলি ঝাড়ু আর ময়লা তোলার বাসন এনে কাঁচগুলো তুলে কার্পেটের ভিজে দাগ মুছে নিল।

এখন সব পরিষ্কার করে দিয়েছি। আর কিছু করতে পারি কি?

হঠাৎ ওয়েসলির একটা প্রশ্নে জুলি চমকে উঠল, জুলি তোমার বয়স কত?

–একুশ। একটু ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিল।

–দেখতে সুন্দর?

–আমি জানি না, জুলি একটু লজ্জা পেল।

গেরিজ বলছিল তুমি নাকি দেখতে সুন্দর। গেরিজ এ সব ভাল বোঝে। আমার হঠাৎ মনে হল তোমার সঙ্গে একা থাকা ঠিক নয়। মিসেস ওয়েসলি এতে খুশী হবেন না।

ওয়েসলি ড্রেসিং–গাউনের কোমরের দড়িটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, এখন আবার ক্লাবে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমার হয়তো তাই করা উচিত, কিন্তু আমি আর পারছি না। যাই হোক, আমি যে রাতে এখানে ছিলাম একথা আমি ওকে বলব না। তুমিও না বললে খুশী হবো।

না কিছু বলব না আমি। জুলি তখনই ভেবে নিল ব্লানশ একথা ঘুণাক্ষরে টের পেলে চরম নোংরামি করবে।

ধন্যবাদ, এ একটা বাজে ব্যাপার বটে। কিন্তু কি আর করা যায়। যাও শুয়ে পড়। ওয়েসলি বলল।

–আর কিছু করবার নেই তো?

জুলি যাবার আগে আমাকে একটা কথা বলবে? ওয়েসলি হেসে বললেন, আমি যখন ছিলাম না, এখানে মিঃ হিউ বেনটন এসেছিলেন কি? আমার পার্টনার?

জুলির মুখ দিয়ে হা বেরিয়ে এসেছিল প্রায়। কিন্তু ওয়েসলির বসে থাকার ভঙ্গি, হাতের নড়াচড়া যেন ওকে সাবধান করে দিল। এখন গভীর লজ্জায় ওর মনে পড়ল মুখ বন্ধ রাখার জন্যে ও বেনটনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে।

না। এই মিথ্যেটা বলতে ওর নিজের ওপর ঘেন্না হল। বলল, কেউ আসেনি।

–আচ্ছা। ওয়েসলি ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন, ঠিক আছে, শুভরাত্রি জুলি। বাতিটা নিবিয়ে দিও। আমার আলোর দরকার নেই।

এই নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে উনি একা বসে আছেন, জুলি চলে যাচ্ছে, এ যেন কিরকম। ভাবলে মন বিষ হয়ে ওঠে।

দেশলাইটা জোরে ছুঁড়ে ফেলে

হ্যারি গ্লেব সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা অস্বাভাবিক রকম জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ধারালো গলায় বলল, আমার ওপর চেঁচিয়ে লাভ নেই। জুলি থাকবে না বলেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কোন লাভ হয়নি। ও কাল কাজ ছেড়ে দেবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে শক্ত শীতল মুখে তাকিয়ে দেখলো।

–ওকে রাজী করাতেই হবে। ও বাড়িতে আর একটা মেয়ে ঢোকানোর সুযোগ আমরা পাবনা। জুলি যদি কাজ ছেড়ে দেয়, আমরা গেছি।

হ্যারি অসহায় ভাবে বলল, আমি তো যা করার করেছি। এখন ও যদি কাজ ছেড়ে দিতে চায়, তবে আমি ওকে থাকতে বাধ্য করতে পারি না। পারি কি?

মিসেস ফ্রেঞ্চ রুক্ষ গলায় বললেন, তুমি বড় নরম মনের মানুষ। তোমার উচিত ছিল কুত্তীটার ঘাড় ধরে রামধোলাই দেওয়া। ও তাই চাইছে। ঠিক মত ম্যানেজ করতে পারলে তুমি যা বলতে ও তাই করত।

হ্যারির বিরক্তি ভরা মুখ।

–আমি মেয়েছেলেদের মেরে ও সব চাইছি না। আমাদের অন্য উপায় ভেবে বের করতে হবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ খেকি কুকুরের মত ঘ্যাঁক করে বললেন, আমাদের আর কিছু করার নেই তা তোমার মাথায় ঢুকছে না? আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।

–না। তাতে লাভ হবে না। জ্বালিও না ওকে। হ্যারি খ্যাক করে উঠল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, তুমি ওকে দেখে গলে পড়ছ না তো হ্যারি?

হ্যারি চায় না মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে সন্দেহ করুক। ওর নিরাপত্তার দিক থেকে ভাবলে উনি ওর বিষয়ে বড় বেশী জেনে ফেলেছেন। তাই ওঁকে ভয় পায় হ্যারি।

মিসেস ফ্রেঞ্চ আসা করছেন হ্যারি ওঁর মেয়ে ডানাকে বিয়ে করবে। উনি যদি এখন সন্দেহ করে বসেন যে হ্যারি জুলির প্রেমে পড়েছে তাহলে ঝামেলা পাকিয়ে ওকে পুলিসের হাতে তুলে দিতেও কসুর করবেন না।

–ছেঁড়া কথা বলো না, হ্যারি বলল, ও আমার কাছে কিছুই নয়, আমি শুধু কোনরকম মারধোর চাই না। তুমিও তা জান!

মিসেস ফ্রেঞ্চ বলল, মারধোরের দরকার পড়বে না। আমি শুধু ওর সঙ্গে কথা বলে ওকে একটু ভয় দেখাতে চাই, বাস্, ওই পর্যন্তই। তাহলেই ও সমঝে যাবে।

প্রস্তাবটা হ্যারির মনোমত হল না, আবার প্রতিবাদও করতে পারল না।

–ঠিক আছে, তবে ওর গায়ে হাত দেবে না কিন্তু। সাবধান করে দিচ্ছি, আমি সহ্য করব না।

মিসেস ফ্রেঞ্চ কাটছাট গলায় বললেন, বেশ! তুমি এখন কেটে পড় দেখি। দরকার পড়লে ডেকে পাঠাব। কাজটা হাসিল করতে আমাদের যেমন প্ল্যান ছিল তেমনি হবে, ওকে যা বলা হবে ও তাই করবে।

–ঠিক আছে। ওর অস্বস্তি হতে থাকল। ও দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, কিন্তু মনে থাকে যা বললাম, ওর গায়ে হাত দিও না।

মিসেস ফ্রেঞ্চ কোন জবাব না দিয়ে কি যেন ভাবতেই থাকলেন। তারপর টেলিফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলেন। থিও টেলিফোন ধরল।

কে? থিও নাকি? কাঁদুনে গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

এখনি চলে এস। একটা কাজ করতে হবে। কড়া গলায় কুম দিলেন ফ্রেঞ্চ।

–হল কি? রাত হয়েছে। আমি ঘুমতে যাচ্ছিলাম।

–হ্যারি ওই হল্যান্ড মেয়েটার সঙ্গে বেড়িয়েছে। মেয়েটা বেগড়বাই করছে। আমি চাই তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ।

–ও এই কথা? থিও রীতিমত খুশী হল, এটা কাজ নয়, এ হল আরাম করা। আমি এখনি আসছি। ও রিসিভার রেখে দিল।

.

থিও পার্কওয়ের উল্টোদিকের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে, টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। মুখের স্যাঁতসেঁতে সিগারেটের ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে বলে থিওর একটা চোখ কুঁচকে আছে।

নটা বাজতে ক-মিনিট বাকি। পথের এদিকটায় লোকজন বিশেষ নেই। মাঝে মাঝে বাস যাচ্ছে। রোদে বসে থাকতে বেশ ভালই লাগছে থিওর। জীবনের বেশীর ভাগ সময়টাই পথের কোণে দাঁড়িয়ে শরীরকে আরামে রেখে, কোন কিছু না করে কাটিয়ে দিয়েছে। সে কোনরকম নড়াচড়াও অপছন্দ করে। গেরিজ পার্কওয়ে থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল। ওয়েসলি কিছুক্ষণ বাদে দারোয়ানের সাহায্য নিয়ে গাড়িতে এসে বসল। গাড়িটা চলে যেতে থিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখন ওকে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে।

সিগারেটটা ঘষে নিভিয়ে পার্কওয়ের বিশাল হলঘরে ও ঢুকতেই দারোয়ান আফিস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওকে তাকিয়ে দেখল।

–কি চাই? দারোয়ানের গলায় সন্দেহ।

–আমার বোনকে দেখতে যাচ্ছি। ৯৭ নম্বর ফ্ল্যাটের চাকরাণী। কোন আপত্তি আছে?

দারোয়ানের সন্দেহ ভাঙাতে থিও আরও বলল, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তো ফোন কর। বল ওর ভাই হ্যারি দেখা করতে এসেছে।

দারোয়ান খচখচ্ করে উঠল, আমায় কি করতে হবে বাতলাতে হবে না। মিসেস ওয়েসলি পছন্দ করবেন না।

–তাকেও বল। থিও হেসে বলল, সবাইকে বল। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দাও। গাবাতে থাকো দোস্ত, আমার তাড়া নেই, মনের সুখে যা করার কর।

দারোয়ান বুঝল ও বোকামি করছে। বলল, তাড়াতাড়ি যাও তবে। গিয়ে দেখা করে এসো। বেশিক্ষণ থেক না। তোমার মত মাল এখানে দেখতে চাই না আমি।

–ভাবিনি তুমি চাইবে। সেইজন্যই এলাম।

থিও অটোমেটিক লিফটের কাছে গেল, দরজা খুলে ঢুকল, দরজা বন্ধ করে চারতলার বোতাম টিপল।

লিফটের গায়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবল। ঝটপট কাজ সারতে হবে নইলে বুড়োটা দেখতে আসবে কি হলো। সাতানব্বই নম্বর ফ্ল্যাটের ঘণ্টা বাজিয়ে ও দাঁড়িয়ে রইল।

জুলি দরজা খুলল।

–এই যে ময়না। থিও ওর হাতের চেটো দিয়ে চিবুকের নিচে একটা নিদারুণ ঠেলা মারল। জুলি ঘুরতে ঘুরতে ভেতরে গিয়ে পড়ল। থিও ঘরে ঢুকে ঘুষি পাকিয়ে বলল, কেঁই কেঁই কোর না। মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে আসছি।

জুলি পিছিয়ে গেল। দেখল সামনে একটা বেঁটে, চৌকো, এলোমলো কালো চুল কোটের কলারে ঠেকেছে, গোল মুখটা ক্ষতবিক্ষত, চোখগুলো কাছাকাছি, ঘোটপাকানো, নিষ্ঠুর একটা পৈশাচিক চেহারা।

উত্তেজিত হয়ো না ময়না। থিও হেসে বলল, ভেতরে চলো। আমি বসতে চাই না, ক্লান্ত।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জুলি থিওকে নিয়ে লাউঞ্জে গেল।

–দিব্যি খাসা, তাই না? এরকম জায়গা ছেড়ে যেতেও মন চায়, অ্যাঁ। জুলিকে দেখল ও, তারপর বলল, তুমি ছেড়ে দিতে চাইছ, তাই না?

জুলি ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি যাবই। কেউ আটকাতে পারবে না আমায়।

–আমি পারব। কাছে বস ময়না। আমরা কথা কইব। থিও ইজিচিয়ারে বসতে বসতে বলল।

জুলি টেলিফোনের দিকে ছুটে যেতে থিও ওকে পাকড়ে ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল। জুলি মুখ হাঁ করতে অমনি ওর মুখে চড় মারল। ভয়ে ও যন্ত্রণায় ওর গলা থেকে ক্ষীণ আর্তনাদ বেরোল।

-এরপর আমার হাতের ঘুষি খাবে। ব্যাপার কি? ধোলাই খেতে চাও?

জুলি অসহায় ভাবে কাঁদতে লাগল। ও আর কোন ঝামেলা পাকাবে না নিশ্চিত জেনে থিও বসল। বলল, তোমাকে এ কাজের শেষ অব্দি দেখতে হবে, নইলে কপালে অশেষ দুঃখ আছে জেনে রেখো। আমি তোমার কোন যুক্তি শুনতে চাই না।

না! জুলি ফুঁপিয়ে উঠল, আমি পুলিশকে বলে দেব। আমি একাজ করতে চাই না।

থিও হাসল। বলল, তাই ভাবছ বুঝি! পকেট থেকে স্যাঁতসেঁতে ব্যাগ বের করে ও তিনটে ময়লা ফটো বের করল, দেখ এগুলো। পুলিশের ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে ঝেড়েছি। সত্যি ছবি, দেখ না, ভাল লাগবে।

জুলি মুখ ফেরাল।

–আমি কিছু দেখব না। ও উদ্ভ্রান্ত গলায় বলল, তুমি যদি না যাও...

থিও ঝুঁকে পড়ে বলল, আবার ধোলাই খেতে সাধ হয়েছে, হাবা হুঁড়ি? ছবিগুলো দেখবি, নাকি ছাতু করবো তোকে?

থিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোল ওগুলো দেখ, আমি তোকে দুবার বলব না।

ধীরে ধীরে ছবিগুলো তুলে দেখে জুলির মুখ ভয়ে বেঁকে গেল।

থিও বলল, ভিট্রিঅলের খেলা। দেখে মনে হয় সত্যি দেখছি। এটার নাম এমি পারসন্স। মাগী বেশ্যা। একটা নিগ্রো ওর এই অবস্থা করে। অ্যাসিড খাবার আগে মাগী দেখতে মন্দ ছিল না। দেখ, দেখতে থাক। ও মাগীটা এডিথ লসন। আরেকজনের খদ্দের

ভাগাতে গিয়ে মুখে অ্যাসিড খায়। আর এই মাগীটা লেস্টার স্কোয়ারে একটা কাফেতে কাজ করত তবে গাবাত বড্ড বেশী। একদিন এক খদ্দের এসে কফি চাইল, যেমনি দিতে যাবে মুখে ঝাড় খেল অ্যাসিড। আর এইটে দেখছে ভিট্রিঅলে ওকে ডুবিয়ে ছেড়েছে? দেখতে খাশা ছিল মাগীটা। শোন ময়না, পুলিস জানেও না একাজ কে করেছে। তুমি যদি ঠিক দানের পিঠে ঠিক দান না খেল তবে তোমাকেও অ্যাসিড ঝাড়া হবে!

কাঁপতে কাঁপতে ছবিগুলো দেখে জুলির শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল।

থিও ওর ঘাড়ে টোকা দিল।

–দেখ, এই যে মাল। তর্জন আর বুড়ো আঙুলে একটা ছোট শিশি ধরে বলল, নিয়ে বেড়াই জানলে? ভেবনা পালিয়ে বাঁচবে, আমি মানুষকে খুঁজে বের করতে বেজায় ওস্তাদ। এখন থেকে তোমার একটা চালে ভুল দেখব, অ্যাসিড ঝাড়ব। মুখটি বুজে যা বলা হল কর, বেঁচে যাবে। আমরা যা পছন্দ করি না তেমন একটা ঝামেলা পাকালে, ব্যস রূপের দশা খতম। বুঝেছো?

–হ্যাঁ।

আর কোন বেলেল্লাপনা না করে বুধবারের মধ্যে আমাদের জানাবে আলমারী কেমন করে খোলে। কোন ছুতো করলে আবার এসে ধোলাই দেব। বুধবার আটটায় মে ফেয়ার স্ট্রীটের অফিসে খবর পৌঁছানো চাই। না গেলে পস্তাবে। বুঝলে?

–হ্যাঁ।

–বেশ। বাথরুমটা কোথায়?

–ওইদিকে। জুলির মাথা কাজ করছে না ও কেন বাথরুমের খোঁজ করছে।

চল সেখানে।

–না...

ময়না, এই না বলার অভ্যেস তোমাকে ছাড়তে হবে। নইলে বিপদে পড়বে। চল।

জুলি বুঝতে পারছিল ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে এখন, কিন্তু ওর কিছু করার ছিল না। প্যাসেজ দিয়ে টলতে টলতে গিয়ে ও বাথরুম দেখিয়ে দিল।

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে থিও বলল, খাসা! এমন বাথরুম সাফ রেখেও সুখ আছে। বেশ ময়না বাথটবের পাশে দাঁড়াও। জুলি কুঁকড়ে সরে গেল।

–আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও। যা বলবে তাই করব। শুধু আমাকে ছুঁয়ো না।

–বোকা ছুড়ির মতো কোর না। আমার টাইমের তিনঘণ্টা আগে তুমি আমায় বিছানা ছাড়িয়ে আমার সকালটা মাটি করেছ। কোন মাগী আমার সঙ্গে এরকম করে না।

দয়া করে... ।

–আর তুমি–কথাটা এত অশ্লীল যে জুলি থমকে গেল।

–দেখ কেমন লাগে। ওর মুখের দিকে ঘুষি ছুঁড়ল। জুলি দু-হাতে মুখ ঢাকতে থিও দারুণ জোরে ওর পেটে ঘুষি চালাল।

থিও হেসে বলল, সুন্দর কার্পেটটা নষ্ট করবে আশা করি নি।

জুলি মেঝেতে ভেঙে পড়ে বমি করতে লাগল, থিও বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

.

সেদিন বিকেল তিনটেয় হ্যারি সেই বেঞ্চটাতেই বসল যেটায় থিও সকালে বসেছিল। অধীর আগ্রহে ওয়েসলির বাড়ির জানলার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল, জুলি এলো না। পৌনে চারটেয় ও রেগে গেল। উদ্বেগও হল।

অস্বস্তিতে ভাবল, কি হলো ওর? ও নিশ্চয়ই অপেক্ষা না করেই চলে যায় নি?

আরো পাঁচমিনিট দেখে ও কাছের একটা বুথ থেকে ওয়েসলির ফ্ল্যাটে ফোন করে কোন জবাব পেল না।

এবার হ্যারি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবল কোন্ চুলোয় গেল? বোবা জানলাগুলোর দিকে আবার তাকালো।

–ওখানে গিয়ে খোঁজ করার অনেক বিপদ। কিছুক্ষণ কিছু ভেবে না পেয়ে মনে আশঙ্কা হলো মিসেস ফ্রেঞ্চ জুলিকে কিছু করে বসেনি তো? এখানে দাঁড়িয়ে সাতকাহন ভেবে কি হবে। একটা ট্যাক্সি ধরল ও, চেলসীর ঠিকানা বলল। যদি ওরা জুলির কোন ক্ষতি করে হ্যারি ওদের টের পাওয়াবে মজা। জুলি এখন ওর।

ওঁদের ছিমছাম ফ্ল্যাটে মিসেস ফ্রেঞ্চ আর ডানা যাচ্ছিলেন। হ্যারি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকলো

–ডানা উঠে এলো।

–একি হ্যারি? আমি তো জানতাম না তুমি আসবে?

হ্যারি ওকে পেরিয়ে মিসেস ফ্রেঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে রাগ ফেটে পড়ছে।

রুক্ষ গলায় হ্যারি বলল, জুলির আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, এলো না। ফ্ল্যাটে ফোন করলাম, কেউ ধরল না। জুলির কি হয়েছে? তুমি কিছু বলতে পারো?

মিসেস ফ্রেঞ্চ পাথরের মতো স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন।

–হ্যারি তুমি যথারীতি গবেটের মতো করছে। ওর কি হলো না হলে তাতে তোমার কি এসে যায়?

অনেক চেষ্টায় হ্যারি নিজেকে সামলে রেখে ভাবল, কিছুতেই এদের জানতে দেওয়া চলবে না জুলিকে ও ভালবাসে। কাজটা হোক, তারপর টাকাটা হাতে পেয়ে এই দুজনকে বোঝাবে ওদের ধারণা সত্যি।

ও কাটাকাটা গলায় বলল, তুমি কি বলতে চাইছ আমি জানি না। সে আমাদের হয়ে কাজ করছে। আমি ওর ওপর চোখ রেখেছি। এখন ও উধাও হয়ে গেছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, কাল রাতে তুমি বললে ও আমাদের হয়ে কাজ করছে না। আমার মনে হয় তুমি ওকে নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করছ হ্যারি। এটা ডানার ওপর সুবিচার হচ্ছে না।

হ্যারি ওঁর দিকে জলন্ত চোখে চাইল।

ডানা ওর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ও তোমার কাছে বিশেষ কিছু কি?

না। কিন্তু আমি জানতে চাই ওর কি হয়েছে?

মিসেস ফ্রেঞ্চ হেসে বললেন, ঠিক আছে শোন। আজ সকালে আমি থিওকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম। ওদের কথাবার্তার পর জুলি এখন মত বদলেছে। তাই নিয়ে বোধহয় মুখগোমড়া করে বসে আছে এখন।

থিও! তুমি ওই নরকের ইঁদুরটাকে পাঠিয়েছিলে?

–কেন পাঠাব না? তুমিই তো বললে ভয়ানক বেগড়বাই করছে।

থিও! অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলে বলল, ও ওর গায়ে হাত দিয়েছিল?

হঠাৎ এত কৌতূহল কেন? আমি তো শুনলাম তুমি বললে মেয়েটি তোমার কাছে তেমন কিছু নয়।

হ্যারি একবার মিসেস ফ্রেঞ্চের দিকে তারপর ডানার দিকে তাকিয়ে দরজাটা আছড়ে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

ডানা ওর পেছনে যাচ্ছিল। কিন্তু মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে আটকে বললেন, শীগগির ওর মেয়েটাতে মন ছুটে যাবে। যদি না ছোটে তবে কাজটা হাসিল হলেই আমি মেয়েটাকে নিকেশ করে দেব। বোকার মত করিস না। চিন্তা করিস না।

–চুপ কর, বলে ডানা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

***

সোমবার সন্ধ্যায় তিতিবিরক্ত মেজাজে ব্লানশ ওয়েসলি বাড়ি ফিরল। ছুটিটা মোটেই জমেনি। বেনটনের মেজাজ কেমন খিঁচড়ে ছিল। ওর কামনার দাক্ট যেন ফুরোচ্ছিল না, হোটেলটাও নরক। হিউ বেপরোয়া জুয়ো খেলে, আকণ্ঠ ধারে ডুবে আছে। ঐ কষটা যদি ভেবে থাকে সেরা সুখ সুবিধা ছাড়া শনি–রবিবার ব্লানশের সঙ্গে কাটাবে, তবে সে ভাবনা বেশিদিন নেই।

পার্কওয়েয়ের বিশাল হলঘরে ঢুকে ঠিক করল এখানে, ওর নিজের বাড়িতে কোনরকম বজ্জাতি বরদাস্ত করবে না ও। এখানে যদি ও আগুন চায়, জ্বেলে দিতে হবে। এখানে টোস্টের সঙ্গে ইচ্ছে হলে এক পাউন্ড মাখন চাইলে যোগাড় করে দিতে হবে। কোনরকম ত্রুটি দেখলেই তুলকালাম ঝগড়া বাধাবে ও।

কিন্তু যেই দারোয়ান ব্লানশকে দেখল অমনি ও ব্লানশকে দারুণ কায়দায় স্বাগত জানালো। ট্যাক্সিকে ভাড়া দেওয়া হল। চিঠিপত্র যত্ন করে বেঁধে দেওয়া হল। ম্যাজিকের মতো একটা জ্বলন্ত দেশলাই চলে এলো ব্লানশের মুখে ধরা সিগারেটের দিকে।

এই সশ্রদ্ধ, মন ভরানো ব্যবহার পেয়ে ব্লানশ গলে গেল।

হাতের দস্তানা খুলে ব্লানশ বলল, হ্যারিস, ফিরে এসে ভাল লাগছে। দুটো দিন জঘন্য কাটলো। এখানকার খবর কি? কেউ এসেছিল?

দারোয়ান জানে এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেই হপ্তায় অন্ততঃ পাঁচ পাউন্ড বখশিস পাওয়া যাবে। ব্লানশ সম্পর্কে ওর একান্ত ব্যক্তিগত মতামত পিলে চমকানো অশ্লীল। ও বলল শনিবার রাতে মিঃ ওয়েসলি আর মিঃ গেরিজ ফিরে এসেছিল ম্যাডাম। রবিবার সকালে একটা লোক আপনার চাকরানীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

ব্লানশ মধুর হেসে, চোখের পাতা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মিঃ ওয়েসলি কি এ দুদিন এই ফ্ল্যাটেই ছিলেন?

–না ম্যাডাম, শুধু শনিবার রাতটা।

মিঃ গেরিজ ওঁর সঙ্গে ছিলেন?

না ম্যাডাম।

ব্লানশ সিগারেটের ছাই ঝাড়ল।

–মিঃ ওয়েসলির কিছু দরকারে দেখার জন্যে আমার চাকরানী ছিল তো? সে ফ্ল্যাট ছেড়ে যায় নি?

না ম্যাডাম। সে ছিল।

ব্লানশ মহোল্লাসে মাথা নাড়লো। একখানা জব্বর ঝগড়ার মশলা জুটেছে বটে। দারোয়ান ভাবল, গরুটা এ থেকে নিশ্চয় প্রলয় বাধাবে। বাধাক গে!

–কে আমার চাকরানীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

দারোয়ান মুখটা কাঁচে, গোমড়া করে বলল, বলল তো চাকরানীর ভাই হয়, কিন্তু ওকে দেখেই টের পেলাম ছোকরা একদম বাজে টাইপের। ওর চেহারা আমার পছন্দ হয় নি মোটেই।

ব্লানশের হাসি মিলিয়ে গেল। ঝঝনে গলায় বলল, তবে ওকে যেতে দিয়েছিলে কেন? তোমাকে পইপই করে বলে যাইনি ও যেন ফ্ল্যাটে কোন পুরুষ মানুষ না ঢোকায়?

এতদিনে নিশ্চয় তুমি বুঝেছো ছুকড়িগুলো বেশ্যার চেয়ে ভালনয়? তুমি কি চাও আমি যখন থাকবনা, তখন আমার ফ্ল্যাট বেশ্যালয় হয়ে ওঠে?

দারোয়ান নিজে বিপাকে জড়িয়ে পড়েছে ভেবে বলল, কাল সকাল নটায় ছোকরা এসেছিল ম্যাডাম। বেশিক্ষণ থাকে নি। কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে গেছে। বেশি থাকলে আমি নিশ্চয় ওকে নামিয়ে দিতাম। আমার বিশ্বাস কোনরকম বদমাইশি করার ফুরসতই পায় নি ওরা।

ব্লানশ সোজাসুজি চাইল ওর দিকে।

কাটাকাটা তেতো গলায় বলল, রবিবার সকাল নটায় শনিবার রাত নটার মতই বদমায়েশি করা যায়। আমি যা জেনেছি, এই পাঁকের পোকাগুলোর কয়েক মিনিটেই বজ্জাতি সারতে কিছু অসুবিধা হয় না। ওর ভাই থাকতে পারে আমার বিশ্বাসই হয় না। তুমি চিরকালের মুখ, গাধা। মনে হচ্ছে কোন গির্জার কবরখানায় না সেঁধোনো অবধি তুমি গাধাই থেকে যাবে।

–হ্যাঁ ম্যাডাম। দারোয়ান সবিনয়ে মাথা নোয়াল।

সহকারী দারোয়ান মালপত্র নিয়ে লিফটের দিকে গেল।

মূর্তিমতী ক্ষুদ্র একটা ঝড়ের মত ফ্ল্যাটে ঢুকে ব্লানশ প্রাণপণে বেল বাজাতে লাগল।

জুলি ছুটে আসতে ব্লানশ ওকে খুঁটিয়ে দেখল চোখের নীচে কালশিটের দাগ, মুখ ফ্যাকাশে। হবারই কথা, কালরাতে একপলকও ঘুম হয়নি।

জুলি কিছু বলল না।

ব্লানশ হুকুম দিল, ব্র্যান্ডি আন ঝটপট। তোমার চেহারা বিশ্রি হয়েছে।

জুলি এই মুহূর্তটায় ভয়ে কাঁপছে। ও ব্র্যান্ডির বোতল আর গ্লাস এনে দিল। সুটকেশটা তুলে নিল।

ব্লানশ শানিত গলায় বলল, যাবেনা। তোমার সঙ্গে কথা আছে। সামনে এসো, যাতে তোমাকে দেখতে পাই।

ব্র্যান্ডি ঢালল ব্লানশ, আধ বোতল ব্র্যান্ডি নির্জলা খেল, আবার ঢালল, সিগারেট ধরালো।

–এই ছুটিটা কিভাবে কাটালে?

জুলি চোখ নামিয়ে বলল, তেমন কিছু নয় ম্যাডাম, এই সব গোছগাছ করলাম। কিছু সেলাই ছিল।

ব্লানশ ধৈর্য হারিয়ে আঙুল নাচাল।

–সে ছেড়ে দাও। কেউ এসেছিল?

না ম্যাডাম।

ব্লানশ কটমটিয়ে চাইল।

বলতে চাও, তুমি ছাড়া এখানে এ–দুদিন আর কেউ আসেনি বা থাকেনি?

একটু ইতস্ততঃ করে বলল জুলি, তাই ঠিক ম্যাডাম।

–আশ্চর্য তো! দারোয়ান বলল, কাল তোমার ভাই এসেছিল?

জুলি তোতলাতে লাগল, আ...আ... আমার ভাই? পরে বুঝল থিও নিশ্চয় দারোয়ানকে ভাই পরিচয় দিয়েছিল। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ..ম্যাডাম। আমি ভুলে গেছলাম। আমি ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিই নি। বেশিক্ষণ থাকে নি। আপনি নিশ্চয়ই দোষ নেবেন না।

ব্লানশ আয়েশ করে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিল। ধারালো গলায় ব্লানশ বলল, আমি মনে করি তুমি মিথ্যে বলছ। আমি বিশ্বাস করি না তোমার কোন ভাই আছে বা তুমি তাকে বাড়িতে ঢোকাও নি।

জুলি বলল, আমি সত্যি কথা বলছি ম্যাডাম ও বাড়িতে ঢোকে নি। ও জাহাজে কাজ পেয়েছে বিদায় জানাতে এসেছিল।

ব্লানশের চোখে ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে লাগল।

–আচ্ছা! তাই বুঝি।

মনে মনে ভাবল, এ বেশ্যা ছুঁড়িটা দেখছি মহা ঘাগী, তবে ওর সঙ্গে ফয়সালা শেষ করিনি এখনো।

ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, তোমার ভাই ছাড়া তবে আর কেউ আসে নি?

জুলি ভাবতে লাগলো দারোয়ান ব্লানশকে কি বলেছে। জুলিকে ওয়েসলি কিছু বলতে বারণ করেছেন। দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করতে লাগলো, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

জবাব দাও।

জুলি ভাবল যা হবার হবে।

না, আর কেউ আসেনি ম্যাডাম।

ব্লানশ হাসল।

–মিঃ ওয়েসলি আসেন নি জুলি? ওর গলা রীতিমত মিষ্টি।

জুলি দেখল ও তো সব জেনে ফেলেছে। এখন আমি কি করি?

ব্লানশ ওকে কোন কিছু বলার সুযোগই দিল না। দুরন্ত রাগে জ্বলে উঠল। চেয়ার ছেড়ে গজরাতে গজরাতে বলল, এই ব্যাপার আঁ? জানি অন্ধরা বাছাবাছি করতে পারে না।

কথাই আছে অন্ধকারে সব বেড়ালই একরঙের কিন্তু ওয়েসলি একটা পথের শুটকো বেড়ালকে পছন্দ করলো?

জুলির কথাগুলো প্রথমে গরম তারপর ঠাণ্ডা লাগল। ওর তো কিছুই করার নেই। যতক্ষণ না মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে যেতে না বলছে ওকে এখানে থাকতেই হবে। জুলি মরিয়া হয়ে বলে উঠল, আপনি ভুল করছেন ম্যাডাম।

–ভুল করছি? চেঁচিয়ে কান ফাটিয়ে দিল, কোন্ সাহসে তুমি মিথ্যে কথা বলো? ব্র্যান্ডির গ্লাসটা জুলির দিকে ছুঁড়ল। জুলিকে পেরিয়ে গ্লাসটা দেওয়ালে লেগে ভাঙল।

–বেরিয়ে যাও সামনে থেকে আধা পয়সার বেশ্যা!

জুলি দরজার দিকে ছুটল। আরো কিছু খুঁজতে লাগল ওকে ছুঁড়ে মারবার জন্যে। ওয়েসলি ঢুকছিলেন। ওঁর সঙ্গে জুলির আরেকটু হলে ধাক্কা লাগছিল।

–কি হচ্ছে এখানে? ব্লানশ? কি হচ্ছে?

ব্লানশ চেঁচাতে লাগল, কি হচ্ছে? তোমার আধপয়সার মেয়েমানুষকে বলছি ও কি জাতের মেয়ে।

ওয়েসলি সংযত গলায় বলল, তুমি নিজেকে শান্ত কর ব্লানশ। কি বলছ তা তুমি নিজেই জান না।

–তুমি অস্বীকার করতে পার ঐ ছুড়িটার সঙ্গে তুমি রাত কাটাও নি?

–আমি শুধু শনিবার রাতে এখানে ছিলাম। তাতেই তুমি চটেছ?

–তোমরা যদি বদমায়েশি না করে থাকো তো ও কেন বলল, তুমি মোটেই এখানে আসো নি?

আমিই ওকে এইকথা বলতে বলেছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার মত নোংরা, সংকীর্ণ মনের মানুষকে ও কথা বললে একটা বিশ্রী ঝামেলা এড়ানো যাবে। এখন দেখছি আমার ভুল হয়েছিল। খুশি হয়েছ?

ব্লানশ উন্মাদ হয়ে উঠল, সস্তার বদমাশ কোথাকার।

তারপর মারের শব্দ, আসবাব উলটে পড়ার শব্দ শোনা গেল।

ভয় পেয়ে জুলি ঘরে উঁকি দিল।

ওয়েসলি মুখে হাত ঢাকা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আর ব্লানশ ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জ্বলছে। চারদিকে টেবিল, ফুলদানি ভেঙে পড়ে আছে। ওয়েসলি শান্ত গলায় বলল, এবার নিশ্চয় তুমি খুশি হয়েছ?

না হইনি! অপদার্থ কোথাকার! ব্লানশ ওঁর মুখে আবার চড় মারলো।

ওয়েসলি পিছিয়ে গেলেন।

যথেষ্ট হয়েছে ব্লানশ। তুমি মাতাল হয়েছ। যাও শুয়ে নেশা কাটাও। তোমায় দেখে আমার ঘেন্না হচ্ছে।

ব্লানশ চেঁচিয়ে উঠল, আমি তোমায় ঘেন্না করি। চারদিকে খ্যাপার মত চেয়ে ও ফায়ার প্লেসের আগুন খোঁচাবার শিকটা তুলে নিল। চোখে খুনীর মত ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। ব্লানশের এই রূপ দেখে জুলির রক্ত হিম হয়ে গেল। ব্লানশ শিকটা নিয়ে ওয়েসলির দিকে ছুটতেই জুলি চেঁচিয়ে উঠল, সাবধান! ওর হাতে শিক।

ওয়েসলি ব্লানশের পাশ কাটাবার কোন চেষ্টাই করলেন না। জুলি এসে ব্লানশের কবজি চেপে ধরল।

–ওঁর গায়ে হাত দিও না। উনি অন্ধ না? জুলি চেঁচিয়ে উঠলো।

ব্লানশ হাত ছাড়িয়ে জুলির দিকে তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলেন। ওর রাগ চলে গিয়ে পরম উল্লাসে হাসতে লাগলো।

–ওঃ হাওয়ার্ড। এ একেবারে বেজায় রগড়! হাসতে হাসতে ব্লানশ বলল, বোকাটা ভেবেছিল, আমি তোমায় সত্যি মারবো।

জুলি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ব্লানশের পৈশাচিক হাসি বিমূঢ় হয়ে শুনতে লাগল। ওর মুখ সাদা।

ব্লানশ হাসতে হাসতে বলল, পালাও জুলি। ওকে বাঁচাতে হবে না তোমায়। আমি ওকে কখনোই আঘাত করব না।

জুলি ঢোঁক গিলে ঘর ছেড়ে বেরোতে যাবে এমন সময় সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো।

হিউ বেনটন টুপি আর দস্তানা জুলির হাতে দিয়ে ওকে দেখলে গম্ভীর হয়ে। জিজ্ঞেস করল, মিঃ আর মিসেস ওয়েসলি বাড়িতে আছেন আশা করি? আমি নিজেই যেতে পারবো।

ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে শিকটা, ভাঙা ফুলদানি, কার্পেটে জলের দাগ দেখে ওর হলদে চোখ দুটো ব্লানশের ওপর গিয়ে স্থির হলো।

ব্লানশ হালকা গলায় বলল, এই যে হিউ। এসেছ, ভালই হল। আমি মেজাজ খারাপ করছিলাম।

বেনটন সাবধানে ঘরে ঢুকল, দুঃখের কথা। হ্যালো হাওয়ার্ড। তুমি ফিরেছ? অফিসে ছিলাম না তুমি আসার সময়ে, সেজন্যে দুঃখিত। আমি ব্রাইটনে শনি রবিবারটা লম্বা ছুটি কাটাচ্ছিলাম।

ওয়েসলি বলল, অফিসে তাই বলল। আশা করি তুমি ভালই কাটিয়েছ?

–মন্দ নয়, ধন্যবাদ। আবহাওয়া সুবিধের ছিল না।

ব্লানশ মধুর গলায় বলল, হিউ, তুমি নিশ্চয় কোন ভাল হোটেলে ছিলে? সস্তার হোটেলগুলো এত বাজে, আগুন থাকে না। ব্র্যান্ডি থাকে না, মাখন দেয় না। জঘন্য।

বেনটন ঘরে পায়চারি করতে করতে বলল, জানি তুমি কি বলছ। তবে এখন সময়টা খুব কঠিন, সময়টা ভাল নয়।

ব্লানশ হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলো, জুলি! জুলি কোথায় গেল। এগুলো সাফ করে ফেল এখনি।

জুলি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করতে লাগল, স্পষ্ট বুঝল বেনটন কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে।

ওয়েসলি হঠাৎ বললেন, একটু মদ খাও হিউ। আজ রাতে আমি বেরোচ্ছি না, বাড়িতেই কাজ করব।

বেনটন বলল, বেজায় আফশোষ! আমি ভাবছিলাম তোমরা দুজন আমার ক্লাবে ডিনার খাবে কি না। আমি একটা হুইস্কি খেতে পারি। কি, মত বদলাবে না কি?

ওয়েসলি সাইডবোর্ডের দিকে যেতেই রাশ বলল, আমায় ব্র্যান্ডি দিও ডার্লিং। হিউ, তোমার ক্লাবে ডিনার খেতে আমার ভাল লাগবে। কি সুন্দর পুরনো ধাঁচের ক্লাবটা। চল না হাওয়ার্ড।

ওয়েসলি আস্তে বললেন, আমার কাজ আছে।

ব্লানশ বলল, তবে তোমাকে ছাড়াই যাব। আমি এখানে সারাদিন বন্ধ থাকবো না কি?

–যা ইচ্ছে। ওয়েসলি দুটো গ্লাস নিয়ে এলেন।

ব্লানশ গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বেনটনকে দিল।

বেনটন বলল, ঠিক আছে, পরে কখনো হবেখন।

–কিন্তু আমি তোমার পুরোন ক্লাবে যেতে চাই বেনটন। হাওয়ার্ড কোথাও যেতে চায় না।

বেশ হাওয়ার্ড যদি কিছু মনে না করে।

–কেন মনে করব? ওয়েসলি হাতড়ে হাতড়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

জুলি কাঁচের টুকরোগুলো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়লো দরজার বাইরে। ওর হৃদপিন্ডের স্পন্দন যেন থেমে গেল। শুনল নেটন বলছে, ব্লানশ! তোমার ওই আশ্চর্য আলমারীর কথা আজ স্ট্যান্ডার্ড কাগজে পড়ছিলাম। লিখেছে ওটা নাকি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। ঐ আলমারীটা আমি কখনো দেখিনি। তুমি কোনরকম রহস্য না করে ওটা আমাকে দেখাবে? আমি কথা দিচ্ছি আমি চোর নই।

দেওয়ালে লেপটে জুলি শুনতে লাগল।

ব্লানশ বলল, নিশ্চয় দেখাব। আমি ভাবিনি ওটা তুমি দেখতে চাইবে। বেশ মজার জিনিষ। জুলিকে সেদিন আটকে দিয়েছিলাম ওর ভেতরে। ব্লানশ হাসল।

–কেন ও কাজ করেছিলে? ওয়েসলির শানিত গলা।

–তামাশা করে। দেখছিলাম ও কি করে। নেকি মূর্ছা গেল।

ওয়েসলি বললেন, কাজটা কি ভাল হয়েছিল? বিপজ্জনকও বটে।

ব্লানশ অবহেলায় বলল, ও তো আর নালিশ করতে আসেনি। আমার ইচ্ছে হলে তামাশা করব। ওর ভাল না লাগলে কাজ ছেড়ে দিতে পারে।

বেনটন মিঠে গলায় বলল, আজকাল তো চাকরাণী মেলা কঠিন। ওকে তত বেশ কাজের বলেই মনে হয়।

দেখতে ফুটফুটিটি আর সস্তার মেম আছে। সেইজন্যে দেখছি তুমি আর হাওয়ার্ড সর্বদা ওর হয়ে ওকালতি করছে। ব্লানশ ধারালো গলায় বলল, হাওয়ার্ড তো এমনই মজেছে কাল রাতে চোরের মত এসে ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে।

ঘরে সহসা নীরবতা নেমে এলো।

অস্বস্তি কাটাতে বেনটন বলল, না ব্লানশ!

তীক্ষ্ণ গলায় ব্লানশ বলল, আমি বলছি না কিছু হয়েছে। আর হাওয়ার্ডের সে বয়সও নেই। তবে জুলি ওর পেছু নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

ওয়েসলি রেগে বলল, আমরা কি এ প্রসঙ্গ থামাবব্লানশ? একদিনের পক্ষে যথেষ্ট আজেবাজে কথা হয়েছে। আমার মনে হয় না এটা তামাশা হিসেবেও উচ্চস্তরের।

বেনটন তাড়াতাড়ি বলল, চল না আলমারীটা দেখি। ঝগড়া বাঁধার আগেই ওর এই অছিলা, দেখতে দেবে আমায়? আমি কারুকে বলতে যাবো না ওটা কেমন করে খোলে।

ওয়েসলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, সে ব্লানশ জানে। আমরা ঠিক করেছিলাম যে কম্বিনেশানটা আমরা দুজন ছাড়া কেউ জানবে না।

–ওঃ, তা যদি হয়...।

ব্লানশ বলে উঠল, একবারেই নয়। ও নিশ্চয়ই দেখবে। হিউয়ের কাছে আমাদের গোপন কিছু নেই, আছে কি?

ওয়েসলি বলল, দেখাতে চাও, দেখাও।

বেনটনের গলায় একটা ব্যাঙ্গের সুর, আমি ধন্য হলাম। আগে ড্রিঙ্কটা শেষ করি, তারপর দেখাবে।

ব্লানশ খিলখিলিয়ে হেসে বলল, আমরা সবাই যাব। আলমারীটা আমার শোবার ঘরে। হাওয়ার্ডই বলতে পারবে ওটা কেমন করে খুলতে, বন্ধ করতে হয়।

জুলি এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি ব্লানশের ঘরে গেল। কোথায় লুকোবে? কাবার্ডে? না ওখানে লুকিয়ে লাভ নেই। বিছানার নিচে। না বিপদ আছে। তাহলে জানলার সামনে

পর্দার আড়ালে। জুলি ছুটে গিয়ে পর্দার ফাঁকে ঢুকে পর্দা টেনে দম আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিট বাদে আলো জ্বলল। জুলি পর্দার জোড়ের সরু ফাঁকে চোখ রেখে সব দেখতে পেল।

ব্লানশ আর বেনটন দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে। ওয়েসলি একটা ইজিচেয়ারে বসলেন।

ব্লানশ বলল, এই যে আলমারীটা এই দেওয়ালের পেছনে। আমি এই স্প্রিংটা ছুঁলে দেওয়ালটা সরে যাবে পাশের দিকে। এটা হাওয়ার্ডের বুদ্ধিতে তৈরী। সমস্ত জিনিষটা ও নিজে তৈরী করেছে। অন্ধ হবার আগে ও সব কিছু নিজের হাতে করতে পারতো। এমনই বুদ্ধি ছিল ওর।

ধাতব হাসি হাসল ব্লানশ। সে হাসি শুনে জুলি শিউরে উঠলো। ব্লানশ বেনটনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, একটা লুকোনো পয়েন্টার আছে। সেটা একটা বিশেষ নম্বরে ঢুকিয়ে দিলে তবে স্প্রিংটা কাজ করবে, নইলে নয়।

ওয়েসলি জিজ্ঞেস করল, অ্যালার্ম বন্ধ করেছে?

না, ওটা ভুললে চলবে না। ব্লানশ বেনটনের দিকে চাইল, অ্যালার্ম বন্ধ না করে যদি পয়েন্টারটা ছোঁও, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ফ্ল্যাট পুলিশে ভরে যাবে।

বিছানার কাছে এসে মাথার দিকে হাতড়ে একটা ক্লিক শব্দ হলো। অ্যালার্মের গোপন সুইচটা বন্ধ হলো।

–এখন অ্যালার্ম বন্ধ হলো। ব্লানশ বলল।

–ও তাহলে এমনি করে তোমরা চোর ধর। বলে ব্লানশকে কাছে টেনে নিল। ব্লানশ প্রথমে একটু চমকে হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে দেখল ও নিশ্চুপভাবে বসে আছে। ও তখন বেনটনের চুমো নিতে মুখ তুলল।

ব্লানশ বেনটনকে ঠেলে দিয়ে আঙুল তুলে সাবধান করে দিল। জুলি ভাবল উনি ঘরে আছেন, কেমন করে ওরা এ কাজ করছে?

এই যে পয়েন্টার। দেওয়াল থেকে লেপের খানিকটা আবরণ সরালো, জুলি দেখল ছোট নম্বরের একটা ডায়াল আছে দেওয়ালের গায়ে।

–আমি পয়েন্টারটা তিন নম্বর অব্দি ঘোরালাম, পা দিয়ে নয়টা টিপলাম, দরজা খুলল।

দেওয়াল সরে, ইস্পাতের দরজা দেখা গেল।

–খাসা, নিখুঁত কাজ। ও ব্লানশকে ধরতে যেতে ব্লানশ ভুরু কুঁচকে ওকে ঠেলে দিল।

ব্লানশ বলল, এই ইস্পাতের দরজায় আরেকটা অ্যালার্ম আছে। ওটা বন্ধ করে দেবে হাওয়ার্ড। ওয়েসলি উঠে দাঁড়ালেন। ব্লানশ বেনটনকে বললো, সুইচটা বাথরুমে এমনি সুইচেরই মতো।

বেনটন শুনল না। ওয়েসলি হাতড়াতে হাতড়াতে বাথরুমের দিকে যেতেই বেনটন ব্লানশকে জড়িয়ে ধরলো। দুজনে দুজনকে পিষে ফেলতে লাগল। বেনটনের ঠোঁট নেমে এলো ব্লানশের ঠোঁটে। আবেগের উন্মত্ততায় ওরা টেরই পেল না ওয়েসলি ফিরে এসেছে।

ওয়েসলি দাঁড়িয়ে আছেন। জুলি দেখল ওর মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। জুলির মনে হল, উনি যেন শুনতে পাচ্ছেন ওরা কি রকম জন্তুর মতো আচরণ করছে।

সহসা বেনটনের আলিঙ্গন থেকে ব্লানশ নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ওয়েসলিকে দেখে মুখ বেঁকিয়ে দাঁত বের করল ও।

ওয়েসলি নিরুত্তাপ গলায় বলল, অ্যালার্ম বন্ধ করে দিয়েছি।

ব্লানশ একমুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারলো না, তারপর বলল, হাওয়ার্ডই বলুক চোর ধরবার ফাঁদটার কথা।

বেনটন তখন রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

–চোর ধরার ফাদটা কি? ওর স্খলিত গলার স্বর।

জুলি তীক্ষ্ণ নজরে দেখল, ব্লানশ ইস্পাতের দরজাটার পাশের সুইচটা বন্ধ করলো। হঠাৎ বাতাস বেরিয়ে যাবার মত হিসহিস্ আওয়াজ হল। ঘরের আলো কেঁপে উঠল। দরজাটা খুলে গেল।

ওয়েসলি বললেন, যদি বা কোন চোর এত অব্দি পৌঁছতে পারে, এখনো অব্দি হয় নি, তবু আলমারীতে ঢুকলেই ও বন্ধ হয়ে যাবে। ভেতরে দেওয়ালের একদিকে একটা লুকোনো আলো আছে। সেটা আলমারীটার উল্টো দিকের ভেতরে দেওয়ালের গায়ে একটা ফটোজেনিক ইলেকট্রিক সেলে পড়ছে।

বেনটন ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা দেখল।

–তারপর? ব্লানশের দিকে চেয়ে ও ভুরু তুলল। ব্লানশ মাথা নাড়ল।

ওয়েসলি বলে চললেন, ভেতরে কোন লোক ঢুকলেই আলোটা বাধা পায়। ফলে সেলের ভেতর দিয়ে যে কারেন্টটা বইছে সেটা বাধা পায়, ফলে কমে যায়। ফলে ট্রায়োড ভাবের গ্রিড ভেস্তালটেজ বেড়ে যায়। তার ফলে দরজা বন্ধ করবার জিনিষটায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ এসে ধাক্কা দেয়।

বেনটন বলল, আশ্চর্য বুদ্ধির খেলা। আমি যদি আলমারীতে ঢুকি, তাহলে বন্ধ হয়ে থাকবো?

ওয়েসলি বললেন, হ্যাঁ, যতক্ষণ না কেউ খুলে দেয়, তুমি দমবন্ধ হয়ে মরবে।

বেনটন অসহায় হাসি হেসে বলল, আমার মনে হয় না আমি সে চেষ্টা করব। দরজাটাকে কন্ট্রোল করার কোন উপায় নিশ্চয় আছে!

–নিশ্চয়। সেলে যে আলোটা পড়ছে সেটা নিবিয়ে দাও। ব্যস, তুমি নিরাপদ।

–কিন্তু এত খুঁটিনাটি, এত বিরাট ব্যাপার করার দরকারটা কি ছিল? খরচও তো প্রচুর লেগেছে এটা বানাতে?

–এটা খেলনা নয়। ওয়েসলি বললেন, ইনস্যুরেন্স থেকে আমি এটা তৈরির খরচ তুলে নেব। ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এটা দেখে মুগ্ধ হয়ে ওদের রেট কমিয়ে দেয়। ফারগুলোই তো তিরিশ হাজার পাউন্ডে ইনস্যুরেন্স করা। তাছাড়া ব্লানশের গয়নাগাটি তো আছেই।

বেনটন বলল, সাংঘাতিক জিনিষ! তবে ইনস্যুরেন্সের কথাটা আমি ভেবে দেখি নি। আমায় এটা দেখানোর জন্যে ধন্যবাদ।

ব্লানশ বলল, এখন তোমার আদ্যিকালের ক্লাবে চল। চল না হাওয়ার্ড?

ওয়েসলি আচমকা বললেন, আমি দুঃখিত। আমার ডিকটেশান দেবার আছে, তুমি যাও।

বেনটন বলল, যদি তাই বল...। যেমন আছে তেমন চলো ব্লানশ, পোশাক পাল্টাবার দরকার নেই।

ব্লানশ সিল্ক কোটটা হ্যাঁঙার থেকে টেনে নিয়ে গায়ে পরল।

–আলমারীটা বন্ধ করে দেবে হাওয়ার্ড?

–হ্যাঁ। ওয়েসলির কাটছাঁট গলা।

পর্দার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে ভাবল জুলি। অপেক্ষা করতে লাগল ব্লানশ যদি ওকে খোঁজে। কিন্তু ও তখন বেনটনকে নিয়ে বেজায় মত্ত।

বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেয়ে জুলি ধড়ে প্রাণ পেল। এরপর পর্দার ফাঁক দিয়ে যা দেখল তাতে ও দাঁড়িয়ে জমে গেল একেবারে।

দেখল হাওয়ার্ড কালো চশমা খুলে ঘরের মধ্যে দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। যেরকম চটপট উনি আলমারীটা বন্ধ করলেন, জুলি বুঝল উনি অন্ধ নন। ও এত চমকে গেল গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরোল। ওয়েসলি শুনতে পেলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ও যেখানটায় লুকিয়ে আছে, পর্দার ঐ জায়গাটার দিকে তাকালেন।

এখন জুলি বুঝল চশমা জোড়া ওঁর মুখোশ। চশমা ছাড়া ঝকঝকে একজোড়া চোখ দেখতে পেয়ে ওর ভয় করল।

উনি নিচু গলায় বললেন, তুমি বাইরে আসতে পার জুলি।

.

ওর স্টাডির বড় ইট বাঁধানো ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন হাওয়ার্ড ওয়েসলি। বিভ্রান্ত, বিহ্বল জুলি সামনের একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল।

উনি যে দেখতে পান জুলি একথা জেনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ওনার কথানুযায়ী ওঁর পেছন পেছন স্টাডিতে এসেছে।

যদিও উনি বেশ স্বাভাবিক আছেন তবুও ওঁকে বেশ চিন্তিত, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কেউই কোন কথা বলল না।

হঠাৎ ওয়েসলি বললেন, ভেব না আমি:তোমার ওপর রেগে আছি। ভয় পাবার কিছু নেই।

জুলি মুখ তুলল। ওঁর চোখ দুটো সাংঘাতিক যেন হীরক দীপ্ত চাউনি। যেন ওঁর সমস্ত সত্তা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ঐ চোখদুটোয়।

ওয়েসলি আস্তে আস্তে ধীর গলায় বললেন, আমার চোখে দৃষ্টি থাকার কথা তুমি কাউকে বলবে না, এমন কি মিসেস ওয়েসলিকেও নয়। আমি কে তা বলতে পারব না। তবে তুমি আমায় কথা দাও যে তুমি কাউকে কিছু বলবে না। আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

জুলি অবাক হল যে উনি ওর কাছ থেকে জানতে চাইলেন না পর্দার ওপাশে জুলি কি করছিল। আর তখনি ওর নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে এল।

ও বলল, নিশ্চয়ই। আমি কিছু বলব না।

আমার দিকে চাও জুলি।

জুলি মুখ তুলে চাইতে উনি হাসলেন। বললেন, তুমি কি সত্যিই আমাকে কথা দিচ্ছো? এর ওপর আমার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করছে, এটুকুই খালি বলতে পারি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে।

জুলি ভাবল, তাই যদি হয়, তবে আমি কোন না কোন কাজে এটাকে কাজে লাগাতে পারি। হয়তো এজন্যই উনি আমার থেকে জানতে চান নি কেন আমি ওখানে লুকিয়েছিলাম।

–কথা দিচ্ছি। জুলি বলল।

কথা দেওয়ার কি কোন দাম আছে? জুলি দেখবে ঘটনা কোন দিকে যায়, সেইমত কাজ করবে।

–ধন্যবাদ। ওয়েসলি প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, তুমি কোন বিপদের মধ্যে আছো, তাই না?

জুলি কিছু বলল না।

–দেখ জুলি, তুমি সব খুলে বল। তুমি যা মনে করছে আমি তার চেয়ে বেশীই জানি। এখানে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে ঢুকেছো তাই না?

জুলি ভাবল কেমন করে উনি টের পেলেন, আর ওর সম্বন্ধে কতটাই বা জানেন উনি?

–উদ্দেশ্য? কি বলছেন আপনি?

–এটা পড়ে দেখ। কাল এসেছে। ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে ওকে দিলেন।

লেখাটা দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল ও। হিউয়ার্ট ওয়েসলিকে একটা ছোট্ট চিঠি লিখেছে। পড়ে ওর মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এল?

প্রিয় মহাশয়,
সাবধান হোন। হ্যারি গ্লেব ফার চোর। জুলি হল্যান্ড আর গ্লেব পরস্পরের বন্ধু। চোখ না খোলা রাখলে আপনার ফারগুলো খোয়া যাবে।
— [জনৈক বন্ধু]

বুড়ো জন্তুটা বলেছিল শোধ নেবে। ও নিশ্চয়ই জুলির ওপর নজর রেখেছিল।

ওয়েসলি খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, একথা কি সত্যি তুমি আর গ্লেব দুজনেই ফার চুরি করতে চাও?

জুলি এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো। তারপর ওঁকে সমস্ত কথা বলবে ঠিক করল। উনি তো চান জুলি ওঁর গোপন কথা চেপে রাখুক। উনি ওর কোন ক্ষতি করবেন না বলে ভরসা আছে। থিও, ওর সঙ্গে যা ব্যবহার করে গেছে, তার থেকে বাঁচতে ওদের কথা ফাস করে দিতে আপত্তি কোথায়? ওদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র সুযোগ!

–ওরা আমাকে বাধ্য করেছে। বলে রুমাল বার করে কান্নার ভান করতে করতে বলল, আপনি জানেন না ওরা কি রকম। আমাকে ভিট্রিয়ল দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছে, মেরে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। আমি একাজ করতে চাইনি।

ওয়েসলি বসলেন।

–এত ভেঙে পড়ো না। গোড়া থেকে শুরু কর। কে এই চিঠি লিখেছে।

রুমালে মুখ ঢেকে জুলি বলল, স্যাম হিউয়ার্ট। আমি ওর হ্যামারস্মিথের কাফেতে চাকরি করতাম। আমি জানতাম ওর কাফে গুণ্ডাদের দেখা করার জায়গা। তবু আমি ওদের হাত এড়িয়ে চলতে পারি নি।

আমি টাকাটা এত চাইছিলাম! আমি কোনদিন অর্থসুখ পাইনি। আপনি জানেননা গরীবহওয়ার কি দুঃখ।

একটা দীর্ঘ বিরতির পর ওয়েসলি বলল, তুমি এরকম কোর না বুঝলে? আমাকে যদি তোমাকে সাহায্য করতেই হয় করবো। তবে আমাকে সবকিছু ভোলাখুলি বলতে হবে। এই গ্লেবের সঙ্গে তোমার কি ঐ কাফেতে আলাপ হয়?

–হ্যাঁ।

এবার জুলি ওর দুঃখের কথা বলে গেল। কেমন করে হ্যারি ওর সঙ্গে প্রেম করে, ও বিয়ে করবে বলেছে সে কথা, কেমন করে হ্যারি ওকে এই কাজটা জুটিয়ে দিল, থিও এখানে এসেছে সে কথা, সব কিছু বলল।

শেষে বলল, আমি জানি আমার এখানে কাজ নেওয়া উচিত হয়নি। মুখটা এমনভাবে ঘুরিয়ে রাখল যাতে ওয়েসলি ওর কান্নার ভানটা বুঝতে না পারে। বলল, আমি শপথ করে বলছি, আলমারীটা দেখার আগে আমি বুঝিনি, ওরা কি করতে চাইছে। যখন চলে যেতে চাইলাম, তখন ঐ থিও আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল, একাজ না করলে মুখে ভিট্রিয়ল ছুঁড়ে মারবে। আমায় ভয় ধরিয়ে দিল।

ওয়েসলি সব কথা মন দিয়ে শুনলেন।

চিন্তা করবার কিছু নেই। উনি হেসে বললেন। আমরা একটা উপায় বের করবো। দেখ দেরী হয়ে যাচ্ছে। তোমার কথা জানি না, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। তুমি রেস্টুরেন্টে বলে দেবে দুজনের খাবার পাঠাতে? এ-সব কথা ভাবতে আমি একটু সময় চাই। তুমি খাবারের ব্যবস্থা কর। আমরা খেতে খেতে কথা বলব।

মদের আলমারীটার দিকে হেঁটে গেলেন। বললেন, এখন তুমি একটু মদ নাও। অত চিন্তার কিছু নেই। তোমার সব কথা শুনে আমি মনে করি না তোমার কোন দোষ আছে।

দুজনের মদ ঢালতে ঢালতে উনি বললেন, যখন তোমায় প্রথম দেখি তখন সঙ্গে কে ছিল গ্লেব?

জুলি লজ্জায় মাথা নিচু করল।

–আমি তখন ভাবতেই পারিনি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমায়। ও রকম পোশাক পরেছিলাম বলে আমি লজ্জা পাচ্ছি।

উনি হাসলেন।

–তোমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, ওর দিকে মদ এগিয়ে ধরে বললেন, আর একদিন এবার আমার জন্যে ওরকম সাজবে।

জুলি চমকিত চোখে চাইল। ওঁর মুখে একথা শুনবে বলে আশা করে নি।

–কে ছিল গ্লেব?

–হ্যাঁ।

–বেশ, তোমার গ্লাসটা নিয়ে যাও। আমি ভেবে দেখতে চাই। খাবার দিতে যেন দেরী না হয়, কেমন?

জুলি রেস্টুরেন্টে দুজনের খাবারের জন্যে ফোন করল। তখন জুলির মনে একেবারে অন্য ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। খাবার আসতে যেটুকু সময় লাগল, তার মধ্যে ও কালো পোশাকের ওপর লাল বেল্ট পরে, মাথায় একটা লাল স্কার্ফ বাধল। আয়নায় নিজেকে মিষ্টি লাগলো দেখে ও খুশী হল। ভাবল যতদিন এই চেহারা আছে, ততদিন আশা আছে ওর।

রান্নাঘরে এসে ও মদ শেষ করে বেশ ফুর্তি অনুভব করলো। এত ভালভাবে সহজে ও সব বিপদ থেকে উৎরে যাবে তা ও ভাবেনি।

জুলি মনে মনে ভাবল, আমার ওপর মিঃ ওয়েসলির চোখ পড়েছে। যদি সাবধানে, চোখ কান খোলা রেখে ওঁকে খেলাতে পারি, তবে আমার জন্যে এমন কাজ নেই যা উনি করতে পারেন না। প্রচুর টাকা আছে ওনার। যা চাইব তাই পাবো। ওই মিসেস ফ্রেঞ্চ, থিও, আর হ্যারির হাত থেকে বাঁচতে পারব আর ওদের শায়েস্তা করতে পারব। এখন আমার ওয়েসলি আছে। ওদের আর দরকার হবে না।

খাবার ট্রে নিয়ে যখন ও গেল তখন উনি পায়চারি করছেন।

–সব তৈরী? একটা ট্রে নিতে নিতে বললেন, খাসা দেখাচ্ছে তোমায়। তুমি ওখানে বস, যাতে আমি তোমায় ভালভাবে দেখতে পাই।

টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। ওঁর দুটি সহৃদয় চোখ দেখে জুলির সব রকম ভয়, অস্বস্তি কেটে গেল।

ওয়েসলি বললেন, খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কাজের কথা বলব না। তুমি যতটা বিপদ বলে ভাবছ, অতটা কঠিন বিপদ নয়, কিন্তু সে কথা পরে হবে। এখন তুমি খুশী তত?

না।

জুলির মনে কোন দুঃখ নেই, খারাপও ওর লাগছে না। তবু ওয়েসলির মন বোঝার জন্যে বলল, আমার এখানে বসা উচিত হচ্ছে না। মিসেস ওয়েসলি ভীষণ চটে যাবেন।

লক্ষ্য করল ওয়েসলির মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

শানিত গলায় বললেন, ওঁর নালিশ করবার কোন অধিকার নেই। নিজের ব্যবহারেই তিনি সে অধিকার খুইয়েছেন। তুমি দেখেছিলে কি করছিলেন ঘরে?

–হা জঘন্য কাণ্ড।

ওয়েসলি বললেন, তবে ওঁর প্রসঙ্গ থাকুক। আমি তোমায় আরেকটু মদ দিই।

উনি আরো মদ ঢালতে লাগলেন। ঘরে এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর উনি ফিরে এসে জুলির দিকে চেয়ে হাসলেন।

–এতে আমি খুব খুশী হয়েছি জুলি। ইদানিং বড় বেশি একাকিত্ব অনুভব করছিলাম। বহুবছর সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া হয়নি। আমার খুব ভাল লাগছে।

জুলি ওয়েসলির আগ বাড়িয়ে কথা বলা দেখে অবাক হলো।

ওয়েসলি ওর বিস্ময় লক্ষ্য না করেই বললেন, তুমি যা বলছিলে আমি তা ভেবে দেখছিলাম। সেই যে জীবনে আনন্দ না পাওয়ার কথা। জুলি, আনন্দ বলতে তুমি কি বোঝ?

জুলি ঝটপট জবাব দিল, যা করতে চাই তাই করতে পারা।

–কি করতে চাও তুমি?

জুলি কোন ইতস্ততঃ না করেই বলল, টাকা চাই, ভাল পোশাক, নাচ গান করব। সবচেয়ে ভাল রেস্টুরেন্টে খেতে যাব। গাড়ি থাকবে আমার, যা খুশী কিনবো। এইসব।

ওয়েসলি হাসলেন।

জুলি সে সব দিয়ে হবেটা কি? তুমি দেখছি অতীতের মধ্যে ডুবে আছে। ওসব জিনিষে আর আজকাল মজা নেই। জীবনের সহজ জিনিষগুলো যেমন ধরো, ভাল বই পড়া, সুন্দর একটা বাগান, হেঁটে বেড়াতে যাওয়া, বাজনা শেখা, এইসব এখন আনন্দ দিতে পারে।

জুলি মনে মনে ভাবল সে আপনি ভুল ভেবেছেন। মুখে বলল, পয়সা থাকলে আমি যা চাই তা সহজে পেতে পারি, আর আমি আনন্দে সময় কাটাতে পারি।

–বেশ দেখা যাবে। তারপর ঐ কাফেতে জুলির অভিজ্ঞতা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। কাফেতে যারা যারা আসতো তাদের বর্ণনা খুব মন দিয়ে শুনলেন।

খাওয়া যখন শেষ হল ততক্ষণে জুলি ওঁর সঙ্গে সহজ হয়ে উঠেছে।

–ঠিক আছে, এই ট্রে-গুলো আগে বিদায় করা যাক তারপর কাজের কথা হবে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, তবে বেশি সময় দিতে পারব না, কারণ শুতে যাবার আগে আমার অনেক কাজ আছে।

রান্নাঘরে ট্রে-গুলো রেখে জুলি ফিরে আসতে ওয়েসলি ওকে চেয়ারে বসতে বললেন আর নিজে ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়ালেন।

নিচু গলায় বললেন, আমরা এখন একটা কাজই করতে পারি, পুলিশের কাছে যেতে হবে।

জুলি ভয় পেয়ে বলল, না, তা করতে পারবো না।

–তুমি ওদের দলকে ভয় পাচ্ছো, তাই তো? কিন্তু আর তো কোন উপায়ও দেখছি না এছাড়া। পুলিশের সাহায্যে আমরা ওদের জন্য ফাঁদ পাতবো, আর সকলকে ধরে ফেলব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

জুলি শিউরে উঠে বলল, কিন্তু যদি ওরা জেনে যায়? যদি থিও পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালায়?

আমাদের এখন দেখতে হবে, যাতে ওরা না পালায়, ওরা যাতে জেনে না যায়। বুধবার ওদের সঙ্গে দেখা করে তুমি বল কেমন করে আলমারী খুলতে হয়। আমি তোমাকে সব খুঁটিয়ে লিখে দেব, তুমি ওটা নকল করে নেবে। গ্লেব যদি তোমার সাহায্য চায় তুমি

সাহায্য করবে। আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে আমরা যে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছি এটা ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। তারপর সব দায়িত্ব আমার।

ওঁর কথা শুনে জুলিও মনে জোর পেল।

জুলি অস্বস্তির সঙ্গে বলল, কিন্তু আমার যদি কিছুনা হয়, তাহলে তো ওরা বুঝে যাবে আমিই ওদের ধরিয়ে দিয়েছি।

তখন ওরা পাল্টা কিছু করার সময়ই পাবেনা। দেখ জুলি তুমি কি বুঝছনা, এটাই তোমার বাঁচার একমাত্র রাস্তা?

–হ্যাঁ। জুলির গলায় অনিচ্ছা।

–ঠিক আছে। বুধবার তুমি গ্লেবের সঙ্গে দেখা করে জানতে চেষ্টা কর ওরা কখন আলমারী ভাঙার কথা ভাবছে। এটা জানা খুবই জরুরী। আমরা তৈরী থাকব। তোমার কি মনে হয় তুমি শেষ অব্দি চালিয়ে নিতে পারবে?

হ্যাঁ। থিওর চিন্তায় জুলির গলা ক্ষীণ।

এক দীর্ঘ মুহূর্ত ওয়েসলি জুলির দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মনে চিন্তা হচ্ছে এসব চুকে গেলে কী করবে?

–জানি না। আমি কিছু ভাবতে পারছি না, জানি না কি করব।

ওয়েসলি আস্তে বললেন, চিন্তার কিছু নেই। আমি তোমায় একটা সুযোগ দিয়ে দেখতে চাই, তুমি যা বললে ঠিক সেইভাবে আনন্দ পেতে পার কিনা, সেইসব জিনিষ থেকে।

জুলির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওয়েসলি। বললেন, আমার ছ-বছরের বিবাহিত জীবনে আমি ভালবাসা বা মমতা কিছুই পাইনি। তিনবছর আগে অন্ধ হয়ে যাবার পর আমার জীবন নিরানন্দ হয়ে ওঠে। এখন যখন চোখ ফিরে পেয়েছি, আমি এখন নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চাই। তোমারই মত একজনকে আমার দরকার। নারীবর্জিত জীবন কাটিয়ে আমি ক্লান্ত। তুমি খুবই সুন্দর। আমি কি বলতে চাইছি আশা করি বুঝেছো?

জুলি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ওর মুখ রক্তের ঝলকে লাল হয়ে উঠল।

উনি বলে চললেন, আমি দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করতে চাই না তবে তোমাকে আমি নিরাপত্তা, একটা বাড়ি, বছরে হাজার পাউন্ড দিতে পারি। তোমাকে খুব একটা জ্বালাতন আমি করব না, তবে আমরা হয়ত সুখীই হবে।

এখন জুলি বুঝল উনি কি বোঝাতে চাইছেন। বছরে হাজার পাউন্ড আর বাড়ি দিয়ে উনি ওর মুখবন্ধ রাখার চেষ্টা করছেন, আর তারই দাম দিয়ে উনি নিশ্চিত হতে চাইছেন যাতে জুলি কারুকে বলে না দেয় উনি দেখতে পান।

তা জুলি বুঝল। ওর মনে তো এই কামনাই ছিল, স্বপ্নেও ভাবে নি ওর প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। উত্তেজনার বহর চেপে রাখতে ওকে রীতিমত চেষ্টা করতে হল।

উনি বলে চললেন, ভেবে দেখ জুলি। আমি আমার মনোভাব তোমাকে জানালাম। সময় হাতে আছে প্রচুর। আমাদের অন্যান্য কাজ আগে করতে হবে। তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি এ কথাই ভাবছি।

জুলি ভাবল এ উনি মিথ্যে বলছেন। তাতে আমার কি? উনি চান তো আমি চুপ করে থাকবো। উনি দাম দেবেন তার।

জানি না কি বলব...জুলি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ওয়েসলি ওকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

তবে এখন বলতে হবে না। ভেবে দেখ। সব চুকেবুকে গেলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব।

ঘর থেকে বেরোতে পেরে জুলি যেন বাঁচল।

.

ওয়েসলির প্রস্তাবের প্রথম চমক কেটে যাবার পর জুলির কাছে আর সবই গৌণ হয়ে গেল। অপ্রীতিকর দুঃস্বপ্নের থিওর প্রসঙ্গ ওর মনের তলায় চাপা পড়ে গেল।

ওয়েসলি চান ও তার রক্ষিতা হয়ে থাকে। জুলি ওঁর শর্তে রাজী। নীরব থাকার পরিবর্তে ও পাবে নিরাপত্তা, নিজের ফ্ল্যাট, হাজার পাউন্ড, বছরে পোশাক। ওয়েসলি কি অগাধ ধনী নন? উনি তো বিশ্রি মোটা বুড়োগুলোর মত নন। উনি চমৎকার লোক। উনি প্রথম

থেকে জুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সাত মাস আগে একটা সস্তার লাইব্রেরীতে জুলি কাজ করছিল, আর এখন নিজের বাড়ি, বছরে হাজার পাউন্ড পাবে।

হঠাৎ ব্লানশ ঘণ্টা বাজিয়ে ওর দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ করল।

ব্লানশের ঘরে যেতে যেতে জুলি ভাবল, আর বেশিদিন নেই, তখন আমারই একটা চাকরানী থাকবে।

— ব্লানশ বিষ মেজাজে, কাটাকাটা গলায় বলল, স্নানের জল ভর। হাতির মত দুদ্দাড় করে আওয়াজ কোর না। আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে।

জুলি কিছু না বলে বাথরুমে গিয়ে টবে জল ভরল না। শোবার ঘরে এসে দেখল ব্লানশ পায়চারি করছে।

ব্লানশ ঘ্যাচ করে উঠল, এই হপ্তা ফুরোলেই তুমি চলে যাবে। আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

জুলি ওর নতুন জীবন শুরুর আগে এখানেই থাকতে চায়–এই ভেবে হেসে ফেলছিল।

–হ্যাঁ, ম্যাডাম, ও এমন খুশী হয়ে কথাটা বলল যে ক্ষুব্ধ ব্লানশ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

–যদি কোন বজ্জাতি করার চেষ্টা কর তো পাবে। এখন বেরোও আমার সামনে থেকে।

কিছুক্ষণ পর ব্লানশ বেরিয়ে যেতে ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। লাউঞ্জে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পড়তে লাগল।

ও নিজেই নিজেকে শোনাল, কিছুদিন বাদে এটাই হবে তোমার স্বাভাবিক রুটিন। এখন থেকে অভ্যেস করা যাক।

কিছুক্ষণের মধ্যে ও অস্থির হয়ে একখানা উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করল, ভাল লাগল না, রেডিও খুলেও যুদ্ধের বাজনা শুনে বিরক্তিতে বন্ধ করে দিল।

ফাঁকা বাড়িটা যেন ওর বুকে চেপে বসতে লাগল।

নিজেকে ভরসা দিয়ে বোঝাল, যখন নিজের বাড়ি হবে, তখন অন্যরকম লাগবে। ঘন্টার পর ঘণ্টা আমি পোশাক পরব, ছাড়ব আর সাজব।

দুপুরের মধ্যে কিছু একটা করতে হবে বলে ও রুপোর জিনিষগুলো সাফ করতে বসল।

আশ্চর্য, কি তাড়াতাড়ি সময় কেটে গেল।

নিজেকে ধমক দিল, এরকম চাকরাণী সুলভ অভ্যাস আমায় ছাড়তে হবে। বিশি!

পাঁচটার ক-মিনিট বাদে ব্লানশ ফিরে এলো। ওঁর অস্থির চলাফেরায় জুলি টের পেল ব্লানশের বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল।

জুলি ভাবল, আমার ভবিষ্যৎনীতির বিরোধী এই অর্থহীন চাকরি আমি চাই না। টাকা থাকলে আমি বরাজ সিনেমা দেখে, নাচের আসরে গিয়ে, গান শুনে সময় কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু ব্লানশ এই টাকার পাঁজায় বসে কি করবে তা ভেবে পায় না, আমিও কি এই অবস্থায় পড়বে।

জুলি ভাবতে লাগলো, মিঃ ওয়েসলি ওঁর চোখের দৃষ্টি নিয়ে কেন ভান করে চলেছেন উনি অন্ধ? জুলির বিশ্বাস হয় না ওঁর কারখানার কাজের সঙ্গে কোন যোগ আছে।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল ব্লানশ টেলিফোনে বেনটনের সঙ্গে কথা বলছে। জুলি দরজায় কান পাতল।

পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ব্লানশের গলা, কাল রাতে পারছি না ডার্লিং। হাওয়ার্ডের সঙ্গে এভরিটে সেই জঘন্য ডিনারে যেতে হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে চেঁচাতে। তুমি টাকা পয়সার ব্যাপারটা গুছিয়ে নিলেই আমি ডিভোর্স করবো। যাহোক কিছু কর।

–তুমি তো শুধু আমার টাকাতেই দিন কাটাতে চাও। তাই না? আমাকে দেখতে হবে না। তুমি নিজে চলবার মতো টাকা যোগাড় কর সোনা। যোগাড় করলেই আমি তোমায় বিয়ে করে ফেলব।

আবার কিছুটা থেমে ব্লানশ বলল, ভগবান, আমি দরজাটা খুলে রেখেছি। সেই ছুঁড়িটা বোধহয় সব শুনল।

জুলি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করলো।

পরে জুলি ওয়েসলির ঢোকার আওয়াজ পেল। জুলি ওঁর কাছে গেল।

ওয়েসলি ওর দিকে না তাকিয়ে এমন ভাব দেখালেন যেন উনি অন্ধ। ওয়েসলি বলল, জুলি ঠিক আছে সব। পুলিশ বলছে যেন কিছুই হয়নি এইভাবে তুমি এগিয়ে যাও। কাল ওদের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দাও আলমারী কিভাবে খোলে।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ওকে দিয়ে বললেন, এটা নকল করে নাও। এতে সব বুঝিয়ে দেওয়া আছে। ওদের যাতে কোন সন্দেহ না হয় সেইভাবে তুমি ওদের থেকে জেনে নাও কখন ওরা ফার চুরি করতে আসবে। পুলিশ ওদের হাতেনাতে ধরবে আর তোমার কোন ভয় নেই।

–আচ্ছা!

জুলি ওদের দুজনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার আশায় দাঁড়িয়ে রইল।

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওয়েসলি বলল, কি ভয় করছে? পারবে তো?

–হ্যাঁ পারবো।

ওয়েসলি বলল, মিসেস ওয়েসলিকে চুরির কথা কিছু বোল না। উনি যেন কোনভাবে জানতে না পারেন।

জুলি মনে মনে খেপে গিয়ে ভাবল, চুলোয় যাক চুরি। মুখে বলল, বলবো না।

–ঠিক আছে। আমরা দুজনে কথা বলছি এটা প্রকাশ না হওয়াই ভালো। বেশিদিন এভাবে সাবধানে চলতে হবে না আমাদের।

জুলি বলল, মিসেস ওয়েসলি আমাকে হপ্তা ফুরোলেই চলে যেতে বলেছেন। তার আগেই কি সব হয়ে যাবে?

–গ্লেবকে যদি শুক্রবার রাতের কথায় রাজীকরাতে পার তবে হবে। আমরা সেদিন বাইরে। থাকব।

জুলি ভাবল, এই হতভাগা চুরি ছাড়া কি আমার কথা একটুও ভাববেন না?

–আমি তো ওদের রাজী করাব। কিন্তু আমার কি হবে? এখান থেকে গেলে তো আমার থাকার জায়গা চাই।

উনি অধীর হয়ে হাত নাড়লেন।

–সে ঠিক হয়ে যাবে জুলি। তুমি এখন পালাও কেমন। উনি হাসলেন।

জুলি বলল, কিন্তু আমাদের হাতে যে বেশি সময় নেই। আপনি আমাকে একটা ফ্ল্যাট দেবেন বলেছিলেন? জুলি ভাবল, উনিযদি এসব চিন্তা না করে থাকেন, তবে বাধ্য করব এই চিন্তা করতে।

নিশ্চয়। তোমার ফ্ল্যাট হবে। আমাদের দেখতে হবে তাই না?

একটু ভাবলেন ওয়েসলি। বললেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? দেখব কি করা যায়। এখন পালাও জুলি। আবার বেরুবার আগে আমার কাজ আছে।

জুলি ওঁর অনিচ্ছা আঁচ করতে পেরেছে। কিন্তু করবারও তো কিছু নেই। তাও কিছুক্ষণের জন্যেও তো ওর কথা ভাবতে বাধ্য করেছে।

–ঠিক আছে হাওয়ার্ড...নিশ্বাস আটকে, লাল হয়ে ও বলল, আ...আমি তোমাকে হাওয়ার্ড বলতে পারি তো?

–ওয়েসলির মুখ আড়ষ্ট, কঠিন হয়ে গেল।

রুক্ষ গলায় বললেন, যা ইচ্ছে তাই ডেক আমায়। এখন যাও।

দরজার কাছে গিয়ে জুলি ঘুরে ওর দিকে তাকাল।

ওর নিশ্চল শরীরে একটা স্নায়ু ও শিরা ছেঁড়া টানটান উত্তেজনা। মনে হয় লোকটা কোন বোমা বিস্ফোরণের জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছে।

.

বুধবার।

সকালটা যেন কাটতে চাইছিল না। ব্লানশ ওয়েসলির সঙ্গে রাতে ডিনারে যেতে চায় নি, মেজাজের ঝাল ঝেড়েছে জুলির ওপর।

ব্লানশের রাগের সঙ্গে জুলির মনে হয়েছে আজ মিসেস ফ্রেঞ্চের সামনে ওকে দাঁড়াতে হবে, মনে হতেই ওর পিলে চমকে গেছে। নিজেকে অসুস্থ মনে হয়েছে।

ব্লানশ লাঞ্চে বেরিয়ে যেতে টেলিফোন বাজলো।

হ্যারি ফোন করছে।

জুলি। রবিবার থেকে তোমায় ধরার চেষ্টা করছি। যতবার ফোন করেছি ঐ ওয়েসলির বউটা ধরেছে। তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হতে চলেছে। থিও তোমায় কি করেছিল?

জুলির সারা শরীর রাগে জ্বলে উঠল।

–তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না। ভীরু কোথাকার। তুমি ঐ শুয়োরের বাচ্চাটাকে আমাকে মারতে পাঠিয়েছিলে? আমি তোমাকে ঘেন্না করি। মুখ দেখতে চাই না তোমার, বলে রিসিভারটা দুম করে রেখে দিল।

আবার ফোন বেজে উঠে, বেজে বেজে থেমে গেল।

প্রথম দেখা হবার পর জুলি হ্যারিকে একটু ভালবেসেছিল। এখন ওয়েসলিকে পেয়ে ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না জুলি।

সামনের দরজায় ঘণ্টা বাজতে ও গিয়ে খুলে দিল। ডিটেকটিভ ইনসপেকটার ডসন।

–আফটারনুন, ডসনের রুক্ষ গলা। ডসন টুপি ছুঁয়ে বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

জুলি ডসনকে দেখবে বলে আশা করেনি। ও সরে দাঁড়ালো, ডসন ঢুকল।

চারিদিকে তাকিয়ে ডসন বলল, ব্রিজ কাফের পর বেশ মুখবদল, কি বল? তুমি তো এখানে উঠেছে, তাই না?

–হ্যাঁ। জুলির গলা ক্ষীণ।

–দেখলাম মহারাণী বেরোলেন। এখন কিছুক্ষণ তো আসছেন না, তাই না?

–আসবেন না এখন।

–ঠিক আছে। চল কথা বলা যাক।

ওকে লাউঞ্জে নিয়ে এলো জুলি। চারিদিকে চেয়ে ডসন বলল, চমৎকার। একটি কাজের জিনিষও নেই। বেশ বেশ, সকলের ভাগ্যি সমান হয় না। বস তুমি।

জুলি বসল। ওর পা কাঁপছে।

মিঃ ওয়েসলি চান না ওঁর স্ত্রী এসব কথা জানুক। মনে করেন মহিলা নার্ভাস হয়ে পড়বেন। দেখে তত মনে হয় না মহিলা নার্ভাস টাইপের। তাই কি?

না

ডসন মাথা নেড়ে বললেন, স্বামীরা হচ্ছে আজব লোক। নাকি উনি ভাবছেন মহিলা তোমায় ছেচবেন।

জুলি চমকে উঠে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন।

যাকগে। এখন শোনা যাক সব। মিঃ ওয়েসলি তোমার কথা আমাদের সব বলেছেন। তবু ভাবলাম তোমার মুখ থেকে সরাসরি শোনা যাক। হ্যারি গ্লেবের সঙ্গে দোক্তিটা তাহলে হঠাৎ হল, তাই না? তখন যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি তো ওকে চিনতেই পারলে না।

জুলি আবার মুখের রা পালটাল।

–আপনার সঙ্গে...তারপরে...ওর সঙ্গে আমার...।

–তাই বুঝি? বেশ বেশ। আমি তোমায় ওর কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কি দিই নি? যাক ওয়েসলিকে সব কিছু বলে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। আগে বা পরে, ওদের আমরা ধরতামই, তোমাকেও ধরতাম।

জুলি চুপ করে সব শুনল। বুঝল কি বাঁচান টা না বেঁচেছে।

ডসন বলল, গ্লেবের সঙ্গে তোমার দোস্তি হবার পর থেকে সব কথা, কোন কিছু না লুকিয়ে বলে যাও।

জুলির ঘোর অনিচ্ছা থাকলেও, ও ওয়েসলিকে যা যা বলেছিল ডসনকে তার সবই বলল।

ডসন শুনতে শুনতে কোন বাধা দিল না, সমানে ওকে লক্ষ্য করে যেতে লাগল।

থিওর কথা বলতে ডসন একটু নরম হল। ডসন হেসে বলল, থিও বড় ভাল ছেলে। দুবছর আগে একটা মেয়ের মাথা ফাটাবার জন্যে ওর ছমাস জেল হয়। আর একটা মেয়েকে ভিট্রিয়ল ছোঁড়ার মামলায় ওকে ধরেছিলাম, কিন্তু মেয়েটা বোকা ওকে সনাক্ত করতে ভয় পেল। যাই হোক, তুমি সতর্ক থেকো, আমরা ওর ওপর নজর রাখবে।

জুলি ভয়ে কেঁপে উঠল।

ডসন বলল, মিসেস ফ্রেঞ্চের ওপরেও আমরা নজর রেখেছি। ডোমেস্টিক এজেন্সী চালাবার ফলে ও বড়লোকদের ভেতরের খবর জেনে যায়। তবে এই প্রথম দেখছি বুড়ি খোজিয়াল ফিট করলো। খুব সতর্ক থেকো, একটি চালেও ভুল কোর না। ওদের সঙ্গে রাতে দেখা হবে?

জুলি ঘাড় নাড়লো।

তোমাকে ভয় দেখাতে চাইছিনা, কিন্তু যদি ওরা আঁচ করতে পারে তুমি ওদের ধরিয়ে দিচ্ছো, তবে ওরা বেজায় শয়তানী করবে।

আমি জানি।

চল দেখি, আলমারীটা তুমি খুলতে পার কিনা রিহার্সাল দিয়ে দেখাও। ওরা চাইবে, আলমারী খোলার সময়, তুমি ওদের সঙ্গে থাকো।

জুলি ওকে ব্লানশের ঘরে নিয়ে গেল।

দেখেশুনে ডসন বলল, ওয়েসলির সঙ্গে ওর স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন?

জুলি সতর্ক হল, জুলি ভাবল, ওর কোন মতলব আছে নাকি?

বলল, বোধহয় ঠিকই আছে। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞেস করবেন।

ডসন নিজের নাকে টোকা মারল। শুকনো হেসে বলল, মনে হয় না আমায় বলবেন। আলমারীটা কোথায়?

জুলি দেখালো।

–দেখি, তুমি খোল ওটা। অ্যালার্ম বন্ধ করে দিতে ভুলো না। আমি মিছে লোকজন নিয়ে হুড়মুড়িয়ে উপস্থিত হতে চাই না।

জুলি অ্যালার্ম বন্ধ করল। বাথরুমে গিয়ে সেখানকার সুইচ বন্ধ করল। ডায়াল ও পয়েন্টার দেওয়ালের যেখানে আছে সে জায়গাটা খুঁজে পেতে ওর দেরীহল। পয়েন্টারের কাটা তিননম্বরে ফিট করে চাবি টিপে ও প্রথমে দরজাটা খুলল।

ভাল, তারপর?

জুলি সুইচ টিপে ইস্পাতের দরজা খুলল। ফটো ইলেকট্রিক সেলে যে আলো পড়ে সেটা নেভাল, সরে দাঁড়াল।

–এমনি করে খুলতে হয় জুলি বলল। ডসন ফারগুলো দেখে শিস্ দিল।

–ভাল! বোঝা গেল সব। এবার বন্ধ কর।

জুলি আলমারী বন্ধ করে সুইচ টিপে দিল। ডসন বলল, আমরা জানতে চাই কখন ওরা আসছে। যদি সাবধানে থাক, তাহলে কোন ভয় নেই। থিওর ওপর নজর রেখো। ওটা হচ্ছে মূর্তিমান বিপদ।

জানি।

ডসন ওকে ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞেস করল, এসবের পর কি করবে, আবার কোথাও ঝামেলা পাকাবে?

জুলি আড়ষ্ট হয়ে গেল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, না।

–ভাল। ডসনের নীল চোখ দুটো কিসের সন্ধানে যেন ঘুরছে, ডসন জিজ্ঞেস করল, মিঃ ওয়েসলি কি তোমার কোন ব্যবস্থা করে দেবেন? ওঁর তোমার ব্যাপারে বেশ আগ্রহ আছে দেখছি।

— জানি না। আমাকে ভাবতে হবে। আশা করি আবার চাকরী পাব।

–সে বরং ভাল। এ–পর্যন্ত তুমি বুদ্ধির পরিচয় দাওনি বরং শিক্ষা হয়েছে তোমার। পরের বার হয়ত কোন ধনী লোক এভাবে তোমায় সাহায্য করবেন না, তাই সামলে চলতে বলছি।

দরজা খুলে ডসন বেরিয়ে গেল।

.

মিসেস ফ্রেঞ্চ অস্থিরভাবে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, যে কোন মুহূর্তে ওই ছুঁড়ি এসে পড়বে। থিওর নজরে আছে, গণ্ডগোল কিছু হবে না মনে হয়।

হ্যারি গ্লেব উদ্বিগ্ন হলেও সহজ ও স্বাভাবিক ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

হ্যারি বলল, থিওকে দলে নেবার জন্যে একদিন তুমি পাবে। ওকে আমি পছন্দ করি না।

কেন? কি হয়েছে? তুমি সব সময় ওর কথা বল। তোমার গজগজানি শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি।

হ্যারি বলল, ওকে বিশ্বাস করা চলে না। ও বিপজ্জনক। ইঁদুরের স্বভাব, কোণঠাসা করলেই কামড়াবে।

–কোণঠাসা করবে কে? ও বেজায় চালাক।

হ্যারি হেসে বলল, থিও চালাক? আমায় হাসিও না। ওর মাথায় পাথর পোরা আছে। শুধু মারজখমই জানে। একদিন ও ঠিক খুনের দায়ে ধরা পড়বে। আমি ওর সঙ্গে থাকতে চাই না।

–মিসেস ফ্রেঞ্চ রেগে বললেন, তুমি বুড়িদের মত কথা বলছে। থিও ঠিকই আছে।

হ্যারি বলল, ও একটা মেয়ের মাথা ফাটিয়ে জেল খেটেছে। পুলিসের কাছে ওর আঙুলের ছাপ আছে। একটা ভুল করে পুলিসের প্যাদানি খেলে ও প্যাক প্যাক করবে। তুমি আমি তখন কি করব?

আমি ওর কথা ভাবছি না। আমি ঐ হল্যান্ড মেয়েটার কথা ভাবছি। নজরে না রাখলে ও মুখ হাসাবে।

হারি মুখ ঘষলো, এগিয়ে বসলো।

-এরপর আমি আমেরিকা কেটে পড়ছি। শহর খুব গরম হয়ে গেছে। এখানে সব ঠাণ্ডা হলে দেখা যাবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ধারালো গলায় বলল, ব্যাপারটা কি? ভয় পেয়ে গেলে না কি? না ভাল ছেলে হয়ে যাচ্ছ?

হ্যারি খোলাখুলিই বলল, অবাক হলো কেন? এতদিন যা জমিয়েছি ভালই চালিয়েছি। আর এ কাজেও ভালই পাবো। যদ্দিন পারি ফুর্তি করে মৌজ করে নেব।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে মনে করিয়ে দিলেন, কাজ এখনো হাসিল হয়নি।

অফিসের দরজা খুলে গেল, ডানা ঢুকল।

ডানা ওর পাতলা আঙুল হ্যারির চুলে বুলিয়ে বলল, মেয়েটা এখনো তো এল না। কি হ্যারি আমায় মনে আছে তো?

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে নিয়ে বলল, ছাড় ও সব। পকেট থেকে চিরুণী বার করে চুল আঁচড়ে নিল ও।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ডানার দিকে তাকিয়ে বলল, এই কাজটার পর হ্যারি এসব ছেড়ে দিচ্ছে, ও আমেরিকা যেতে চাইছে।

ডানা বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব হ্যারি। তাই না হ্যারি?

ডানার দিকে চেয়ে ধূর্তের হাসি হাসল হ্যারি।

তারপর হ্যারি বলল, হতে পারে, তবে আমি এখনো মনস্থির করি নি।

বাইরের দরজায় কে করাঘাত করল।

এসেছে, ডানা বলল, আমি যাচ্ছি।

জুলি অন্ধকার প্যাসেজে দাঁড়িয়ে।

–এস, ডানা, বলল, দেরি করে ফেল নি?

করেছি কি? জুলি কাটাকাটা গলায় বলল, আমি জানি না। জুলির গলা শুকিয়ে গেছে, বুক ধড়াস ধড়াস করছে, তবু নিজেকে শাসনে রেখেছে।

–এই যে ময়না! একটা বিদঘুঁটে গলা শুনে জুলি পিছন ফিরে তাকাল।

অন্ধকার থেকে থিও বেরিয়ে এল।

সারা পথ তোমার পেছনে ঘুরছি, পাছে মত বদলাও। থিওর মুখের দুর্গন্ধ জুলির মুখে ঝাপটা মারল।

ডানাও থিওকে অপছন্দ করে। ও জুলিকে বলল, ভেতরে এসো।

জুলি অফিসের ভেতরে এল। থিও জুলির পা মাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি আমাকে দুঃস্বপ্নে দেখেছ, আমি হলফ করে বলতে পারি। ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছি তোমার।

হ্যারি ওর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মুখ বন্ধ কর বাঁদর, তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে?

থিও হ্যারির দিকে বিষাক্ত চোখে চেয়ে মিসেস ফ্রেঞ্চকে বলল, এ মর্কেলটাকে আমাকে ঘাঁটাতে বারণ করে দাও। বিরক্তি ধরে যাচ্ছে আমার।

হ্যারি ভীরু হাসি হেসে বলল, এই যে জুলি। এস, আমার কাছে বস।

থিও হাসলো।

–বেশ হয়েছে। এবারে ময়নার পেছনে লাথি মার।

মিসেস ফ্রেঞ্চ দুজনকেই চুপ থাকতে বললেন। জুলির দিকে চেয়ে বললেন, বস, আলমারীটা কি করে খোলে তুমি জেনে নিয়েছ?

–হ্যাঁ। জুলি বলল।

থিও বলল, আমি ভাবছিলুম তোমায় সিধে করব ময়না।

হ্যারি উঠতে যাচ্ছিল, মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

–বেশ বেশ। বস, আমাদের বল।

জুলি হ্যারির কাছ থেকে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

–আমি লিখে এনেছি। পড়ে নিন। জুলি বলল।

থিও সামনে ঝুঁকে পড়লো।

–ঠিক হয় যেন। যদি কায়দা করার চেষ্টা কর, তবে পস্তাবে।

হ্যারি হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়ে থিওর মুখে মারল। থিও চেয়ার শুদ্ধ পড়ল। রাগে। গালাগালি করতে করতে ও একটা ছোট অটোমেটিক পিস্তল বের করল। হ্যারি তৈরীই ছিল, লাথি মেরে থিওর হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে কুড়িয়ে টেবিলে রাখল।

থিওর দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে হ্যারি বলল, তোমায় একবার সাবধান করে দিয়েছি। বলেছি যখন চুপ কর, জবান বন্ধ, তখন বন্ধ থাকবে। আমাকে বন্দুক দেখাবে না, তিন পয়সার বেঁটে মান কোথাকার?

থিও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার নিচের সোফাটায় গিয়ে বসল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ পিস্তলটা তুলে নিয়ে ব্যাগে পুরলেন।

কতবার তোমায় বলেছি বন্দুক সঙ্গে রাখবে না? রাগে ঝকঝকে চোখে বললেন, হ্যারি কি বন্দুক রেখেছে?

হ্যারি জ্বলন্ত চোখে থিওর দিকে তাকিয়ে বলল। না, আমি ওই ডরপোকের বাচ্চা নই। আমি কোনদিন বন্দুক রাখি না, রাখবোও না। আমার মগজ আলুভাতে হয়ে যায় নি।

মিসেস ফ্রেঞ্চ গর্জে উঠলেন থিওকে, তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবো।

থিও ছাতের দিকে চেয়ে ঠোঁট ওল্টালো। ওর চোখে ঘৃণা জ্বলছে।

জুলির ভয়ে, বিস্ময়ে, বন্দুক দেখে হাড় হিম হয়ে গেছে।

মিসেস ফেঞ্চ বলেন, ঠিক আছে, এবার কাজের কথা হোক, সে কাগজটা কোথায়?

পরিষ্কার অক্ষরে লেখা একটা কাগজ জুলি মিসেস ফ্রেঞ্চের সামনে রাখল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ এবং হ্যারি কাগজটা পড়ে দেখলেন।

–দুটো অ্যালার্ম! হ্যারি শিস দিয়ে উঠলো। ওরা দেখছি সবরকমে সাবধান হয়েছে। আমি আগেই ভেবেছি ওখানে ফোটো ইলেকট্রিক সেল আছে। ঠিক আছে, আমরা যা চাই, ঠিক তাই।

মিসেস ফ্রেঞ্চ জুলির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চাইলেন।

ঠিক বলছ ওটা খুলতে পারবে?

জুলি মাথা নাড়ল।

জুলি বলল, মিসেস ওয়েসলি ওঁর এক বন্ধুকে খুলে দেখাচ্ছিলেন, আমি ঘরে লুকিয়ে থেকে সব দেখেছি।

–ঠিক আছে, মিসেস ফ্রেঞ্চ কাগজটা নামিয়ে রাখলেন। এবার আমরা কাজে হাত দিতে পারি। আজ বুধবার। এই হপ্তার শেষ নাগাদ আমি সবকিছু তোড়জোড় শেষ করতে পারবো। ওরা শনিবার কি করছে? কি জান?

জুলি বলল, আমি শনিবার কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। মিসেস ওয়েসলি আমায় নোটিশ দিয়েছেন।

সকলে এমনকি থিও-ও ওর মুখের দিকে তাকাল।

–কেন? মিসেস ফ্রেঞ্চ রুক্ষ গলায় জানতে চাইলেন।

উনি আমায় পছন্দ করেন না। আমার কোন দোষ আছে বলে উনি আমায় ছাড়াচ্ছেন না।

–আমরা যখন কাজ হাসিল করবো ওখানে তোমাকে থাকতে হবে। এতে তুমিও জড়িয়ে পড়েছ এখন। তাহলে শুক্রবারেই ঠিক রইল। মিসেস ফ্রেঞ্চ বলল।

জুলির মনে হল একটু অনিচ্ছা দেখানো বুদ্ধির কাজই হবে। বলল, আমাকে আপনারা রেহাই দিচ্ছেন না কেন? আমি তো আলমারী কেমন করে খোলে বলেছি, আর কিছু করতে পারবো না।

এখন আমার কথানুযায়ী চলতে হবে তোমায়। এ জাল কেটে বেরোবার উপায় নেই তোমার। হ্যারি ওখান থেকে বেরিয়ে আসার আগে তোমাকে বেঁধে রেখে আসবে। যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রেখে চললে আমরা তোমায় দেখব, ওরা তোমায় কিছু করতে পারবে না। তোমার ভাগের আন্দাজ পাঁচশো পাউন্ড তুমি পাবে। পলিশ জেরা করলে বলবে, তিনটে নোক সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে তোমায় বেঁধে রাখে, তুমি শুধু ওদের ওভারকোট আর মুখঢাকা টুপি ছাড়া আর কিছুই দেখার সুযোগ পাও নি। যা বলবে বানিয়ে টানিয়ে বোল, তবে শেষপর্যন্ত তাই বলে যেও। তুমি তো কচি খুকিটি নও! বুঝলে?

জুলি ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, হ্যাঁ।

–বেশ। এবার হ্যারির দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কাজ হচ্ছে জুলির সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ হাসিল করা। ফারগুলো নিয়ে চাকরদের লিফটে ওগুলো তুলে দেওয়া। থিও নিচ থেকে ওগুলো নামিয়ে নেবে। পেছনের গলিতে গাড়ি থাকবে।

একটু থেমে আবার বললেন, বাড়ির নিচতলা থেকে গলি মাত্র এক-পা রাস্তা। ফারগুলো লিফটে তুলে দিয়েই ফিরে গিয়ে গয়নাগুলো নেবে। জুলিকে বেঁধে ফেলে চাকরদের লিফটে নিচে চলে যাবে। সময়টা আমরা পরে ঠিক করে নেব। জুলির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, ওয়েসলিরা শুক্রবার বেরোবে বলে মনে হয়?

জুলি বলল, আমি শুনেছি ঐদিন ওঁরা রাতে বাইরে খাবেন, থিয়েটারে যাবেন।

–ঠিক আছে। হ্যারির দিকে চেয়ে মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, শুক্রবার সন্ধ্যা আটটা।

হ্যারি মাথা নাড়ল। মুখে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু ওর চোখে একটা অস্বস্তি উঁকি দিতে লাগলো।

মিসেস ফ্রেঞ্চ জিগ্যেস করলেন, কোন প্রশ্ন আছে?

হ্যারি বলল, জুলিকে ওখানে ফেলে আসাটা আমার ভাল লাগছে না। পুলিশ ঠিক বুঝতে পারবে ভেতর থেকে খোঁজ- খবর নিয়ে একাজ করা হয়েছে। ও যদি মাথা ঠিক রাখতে না পারে, যদি সাহস হারিয়ে ফেলে, আমরা ফেঁসে যাবো।

থিও হঠাৎ উঠে বসল।

বলল, সাহস হারাবে না। সাহস হচ্ছে শেষ জিনিষ যা খোয়া যাবে। থিও ওর তীক্ষ্ণ গলায় বেসুরো পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগল।

হ্যারি ওর দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে বলল, এতে মজার কি আছে রে?

–চুপ কর! মিসেস ফ্রেঞ্চ হ্যারির দিকে চেয়ে বললেন, ও আজ ভয়ানক বাঁদরামি করছে। ওর কথায় কান দিও না। জুলি মাথা ঠিক রাখতে পারে কিনা সে ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। আমরা ওকে সঙ্গে নিয়ে এলে, পুলিশ ওর খোঁজ করতে গিয়ে আমাদের ধরে ফেলবে।

হ্যারি অস্বস্তি নিয়ে বলল, ঠিক আছে। জুলির দিকে চেয়ে বলল, তোমার কি মনে হয় জুলি? শেষ অবধি পারবে?

জুলি খেঁকিয়ে উঠল, পেছনে গুতো দিয়ে এর মধ্যে টেনে নামিয়ে, এখন ভালবাসা দেখানো হচ্ছে?

হ্যারি লাল হয়ে গেল। বলল, বেশ তাই যদি বল। মুখ ফিরিয়ে, আর কিছু আছে কি?

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, খুঁটিনাটি সব আজ আর শুক্রবারের মধ্যে বলে কয়ে নেব। তাহলে ঐ ঠিক রইল, শুক্রবার, সন্ধ্যা আটটা।

আমি চলি তাহলে। হ্যারিকে যেতে দেখে ডানাও ওর সঙ্গে যেতে চাইল। হ্যারি ওকে বলল, খুবই দুঃখিত। একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আচ্ছা গুডনাইট। ও বেরিয়ে গেল।

ডানাকে এভাবে অপদস্থ হতে দেখে জুলি মনে মনে খুশী হল। ও অবশ্য এখন আর ঐ চিটিং বাজ, গুণ্ডা হ্যারিকে ভালবাসে না।

জুলি উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, আমি এবার যেতে পারি?

মিসেস ফ্রেঞ্চ মাথা নেড়ে বললেন, জুলি সাবধান! কোনরকম চালাকি করতে যেও না। থিও নজর রেখেছে তোমার ওপর।

জুলি কারোর দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। ভয়ের সঙ্গে মনে একটা জয়ের উল্লাস। এখন শুধুই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। দায়িত্ব এখন ওর ঘাড় থেকে পুলিশের ঘাড়ে চলে গেছে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে দ্রুতপদে হেঁটে ও নিউ বন্ড স্ট্রীট পেরোল, বার্কলি স্কোয়ারের দিকে এগোল।

সহসা ছায়ার আড়াল থেকে হ্যারি বেরিয়ে এসে ওর কনুই ধরে পাশে পাশে চলতে লাগলো। জুলি হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলো।

হ্যারি বলল, খেপে যেও না সোনা। আমি জানি ঐ থিওটা তোমার উপর হামলা করেছে, কিন্তু আমি জেনেছি অনেক পরে, আর তখন আমার কিছু করারও ছিল না। আমার কোন দোষ নেই।

জুলি হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, চলে যাও আমার কাছ থেকে। আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।

হ্যারি বিব্রত হয়ে বলল, ওরকম কোর না জুলি। শোন, এ ব্যাপারটা চুকে গেলে আমরা বিয়ে করে আমেরিকা চলে যাবো। এ জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। একটু হাসো। বল, আমার সঙ্গে যাবে।

জুলি বলল, চলে যাও! তোমায় আমি ঘেন্না করি। তুমি একটা চিটিংবাজ, আর কিছু নও। পেছন ফিরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকলো।

হ্যারি ওকে জাপটে ঘুরিয়ে ধরে বলল, কি হয়েছে জুলি? আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি জানি আমিই তোমাকে এর মধ্যে জড়িয়েছি কিন্তু সে ক্ষতি আমি পুষিয়ে দেবই।

–আমাকে ছাড়ো। তোমার মুখ দেখতে চাই না।

–তুমি আমেরিকা যেতে চাও না? আমি তোমায় দুনিয়ার সব মজা লুটে এনে দেব। এস সোনা, একটা চুমু দাও।

ও হাত বাড়ালো। হ্যারির এই অসীম আত্মবিশ্বাসে ঘা দেবার জন্যে জুলি ওর মুখে চড় মারলো। আমার পেছন ছাড়ো। বুঝলে? চেঁচিয়ে পেছন ফিরে জুলি অন্ধকারে দৌড়ে গেল।

হ্যারি স্তব্ধ হয়ে মুখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পিকাডিলি হোটেলের লবিতে

পিকাডিলি হোটেলের লবিতে ওয়েসলির সঙ্গে মিলিত হবার পর থেকেই জুলি খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। ওয়েসলির সঙ্গে দেখা হবার আগে অবধি বিকেলটা ওর ভালই কেটেছিল। ওর সবচেয়ে ভাল পোশাকটা পরেছিল। থিও ওর পিছু নিতে পারেনি, সেজন্যে মনে উত্তেজনা ছিল। বাস থেকে নেমে মুখ লুকিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠার মধ্যেও উত্তেজনা ছিল। কিন্তু ওয়েসলি অন্ধের ভান করছে জুলি তা জানত। আর যেভাবে মানুষ ওয়েসলির দিকে তাকাচ্ছিল, পথ ছেড়ে দিচ্ছিল সাহায্য করতে চাইছিল, তাতে জুলি বেজায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল।

ওর মনে হচ্ছিল ঈশ্বর সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে ওয়েসলিকে শিক্ষা দেবার জন্যে সত্যিই অন্ধ করে দেবেন। ওয়েসলির পক্ষে এরকম আচরণ অনুচিত।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করলে জুলির অস্বস্তিটা টের পেয়ে ওয়েসলি হেসে বলল, বেচারা জুলি! তুমি নিশ্চয় বিব্রত বোধ করছে। ভেব না অভ্যেস হয়ে যাবে।

জুলি রেগে গিয়ে বলল, কিন্তু এরকম আচরণ করাটা অন্যায় হচ্ছে।

ওয়েসলি সহসা শানিত গলায় বলল, অভিনয় যখন করতে হয়, তখন নিখুঁত হওয়া চাই। আমাদের যদি সম্পর্ক রাখতেই হয়, তবে আমি যেরকম, সেটাই তোমায় মেনে নিতে হবে।

ডিউক স্ট্রীটে এস্টেট এজেন্ট ফাউলার অ্যান্ড ফ্রিবডির অফিসের সামনে ট্যাক্সি থামলো।

ওয়েসলি তার কি দরকার বলতে মিঃ ফাউলার চমকিত হয়ে জুলির দিকে তাকালেন। ওঁর চোখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হল ও রেগে গেল। উনি বার্কলে স্কোয়ার আর ভিগো স্ট্রীটে দুটো ফ্ল্যাটের বর্ণনা দিলেন।

ট্যাক্সি নিয়ে ওরা দুটো জায়গাই গেল। জুলির ভিগো স্ট্রাটের ফ্ল্যাটটাই বেশি ভাল লাগল। শোবার ঘরে গাঢ় নীল ছাতে রুপোলি তারা আঁকা। গোলাপী কাঁচের আয়না দিয়ে একদিকের দেওয়ালের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঢাকা।

জুলি উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করে শোবার ঘর, বাথরুমটা দেখে মহাখুশী। ওয়েসলি ওকে দেখছিলেন। ওঁর চাউনিতে বিদ্রূপ ফুটে উঠলো।

জুলি বলল, এটা চমৎকার। বার্কলে স্কোয়ারের ওই আদ্যিকালের ফ্ল্যাটের চেয়ে এটা অনেক ভাল।

ওয়েসলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তুমি খুশী হলেই হলো, কিন্তু আমার মনে হয় এ জায়গাটা খেলল। খারাপ মেয়েমানুষদের জায়গা।

জুলি লাল হয়ে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, সে আমি জানি না। এ জায়গাটা আমার চাই।

–বেশ, তোমার যখন ভাল লেগেছে তাহলে এটাই নাও।

–হ্যাঁ, আমি এটাই চাই। মনে মনে ভাবল, ওয়েসলির যদি জায়গাটা পছন্দ না হয়, তিনি না এলেই হলো।

ওরা যখন এজেন্টের অফিস থেকে বেরুল, ওয়েসলি ওর হাতে সামনের দরজার চাবি দিলেন।

চাবিটা নিয়ে ধন্যবাদও দিল না জুলি। ওর রাগ তখনো পড়েনি।

ওয়েসলি বললেন, এখন বোধহয় তোমায় কিছু পোশাক কিনে দিতে হবে। এখন আর তোমার জীবন সেই ব্রিজ কাফে, হ্যারি গ্লেব, ব্ল্যাক মার্কেটে জড়িয়ে নেই। বুঝেছ? না বোঝনি।

তাই হবে। জুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল। সেই পুরোন দলের কারোর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবেনা তার। জুলি যে পুলিশকে সব বলে দিয়েছে, আজ হোক কাল হোক সে কথা ছড়িয়ে পড়বেই। একবার জানাজানি হয়ে গেলে আর কেউ জুলিকে পাত্তা দেবে না।

ওয়েসলি ওর জন্যে জমকালো নয় তবে চমৎকার কাটছাঁটের সব পোশাক কিনলেন। সে পোশাক পড়ে দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জুলি দেখল তাকে বেশ অভিজাত আর স্মার্ট দেখাচ্ছে। দোকানের লোকটি বেরিয়ে যেতে ওয়েসলি ওর দিকে মুগ্ধ চোখে চাইতে জুলি খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল।

তবে যখন ওয়েসলি ওকে একটা মিঙ্ক কোট কিনে দিলেন, তখন ওর আনন্দ আর বাঁধ মানে না। তখনি জুলি ওয়েসলির সব রকম খুঁতখুঁতুনি ক্ষমা করে দিল।

ওয়েসলি বললেন, এখন আমি কারখানায় যাচ্ছি। আশা করি তোমার বিকেলটা ভালই কাটবে।

মিল্ক কোটটা পেয়ে জুলি বেজায় আনন্দিত। ও ওয়েসলিকে কিছু প্রতিদান দিতে চাইল।

ওয়েসলিকে চোখের ইশারায় আমন্ত্রণ জানিয়ে জুলি বলল, হাওয়ার্ড, তুমি কি আমার ফ্ল্যাটে ফিরতে চাও?

চমকে, অসহজ ও অস্বস্তির হাসি হেসে, ওর হাতে আদর করে ওয়েসলি বলল, এখন নয় জুলি, আমাকে কাজের জায়গায় ফিরতে হবে।

তাড়াতাড়ি ওয়েসলি একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। জুলি সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্রুদ্ধ জুলি ভাবল, নাকউঁচু, অহঙ্কারী লোক কোথাকার! ঠিক আছে আমাকে না চাইলে আমার বয়েই গেল। পরে যদি ওর ইচ্ছে হয়, আমার ইচ্ছে হবে না।

যে সাদা পোশাকের ডিকেটটিভটি পরম ধৈর্যে ওদের সারা বিকেল অনুসরণ করেছে ওয়েসলিকে চলে যেতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সারা বিকেলটা বেজায় হয়রানি গেছে। এখন হেড অফিসে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে।

জুলির পেছন পেছন যেতে যেতে ওর মনে হল, এ আবার কি নতুন খেলা শুরু হল। মনে হচ্ছে, ওয়েসলি ওকে নতুন বাসায় তুলছেন? জুলি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। ওর সুডোল

পা দুটো দেখতে দেখতে ও ভাবল ওয়েসলিকেও তো দোষ দেওয়া যায় না, অন্ধ হলে কি হবে মাল ভাল পেয়েছে।

জুলি বোঝেনি ওকে কেউ অনুসরণ করছে। ও পিকাডিলির দিকে যেতে লাগল। পুরো সন্ধ্যাটা ওর সামনে। ওর এখন আনন্দ করতে ইচ্ছে হলো।

.

মিসেস ফ্রেঞ্চের অফিস থেকে বেরিয়ে হার্লেকুইন ক্লাবে এসেছে হ্যারি গ্লেব। এখন ওর একটু মদ দরকার। চুরির বিষয় সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যবস্থা শেষ হল।

সিঁড়ি দিয়ে ক্লাবেউঠতে উঠতে হ্যারি ভাবল, শুধুই মনে হচ্ছে বিপদ হবে। যা এটাই শেষ, আর একাজ অন্ততঃ কিছুকাল করবো না। যথেষ্ট হয়েছে।

লাউঞ্জে ঢুকে দারোয়ানের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সোজা বারে ঢুকে গেল। সাড়ে চারটে বেজে ক-মিনিট হয়েছে। দুজন বেশ্যা টুলে বসে হুইস্কি খাচ্ছে।

হ্যারিকে দেখে, বেশ্যা দুটোর সঙ্গে কথা বলে ক্লান্ত বারম্যান খুশিতে চিকমিকিয়ে উঠল। কিন্তু হ্যারির কথা বলার মেজাজ নেই। ও ডবল হুইস্কি নিয়ে জানলার ধারের একটা টেবিলে একা এসে কল।

সারারাত ধরে হ্যারি জুলির কথা ভেবেছে। রাতে না ঘুমলে ওর শরীর খারাপ হয়।

আগামীকাল আমাদের কাজ হাসিল হবে। তারপর জুলির মন ফেরাবার চেষ্টা করব। ওকে । যদি এই কাজে না জড়াতাম, তাহলে ওকে নিয়ে কোন ঝামেলাই হতো না।

হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে হ্যারি চিন্তা করতে লাগল, মিসেস ফ্রেঞ্চের পক্ষে জুলিকে ফ্ল্যাটে রেখে এস বলা খুব সোজা। সেটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে জুলিকে নিয়ে আমি যদি কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকি কিংবা দেশ ছেড়ে পালাই দুজনে, সেটাই ঠিক কাজ হবে।

কিন্তু জুলি কি আমার সঙ্গে আসতে রাজী হবে?

হঠাৎ ওর মনে পড়ল আজ বিকেলটা জুলি যদি ছুটি পায়। কি করছে ও? ও নিশ্চয় ওয়েস্ট এন্ডে গোমড়া মুখে দোকান দেখে বেড়াচ্ছে।

দেখি, ওকে একটু খুঁজে দেখি। হয়তো বুঝিয়ে বললে বুঝবে।

বারম্যানের দিকে মাথা নেড়ে বিদায় জানিয়ে ও ক্লাব থেকে বেরিয়ে পিকাডিলি পৌঁছে পার্ক লেনের দিকে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকলো। হাইড পার্ক অব্দি গিয়ে ও বার্কলে হোটেলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ও হঠাৎ জুলিকে দেখল, জুলি চটপট হেঁটে পিকাডিলির দিকে যাচ্ছে।

একেই বলে ভাগ্যি। জুলিকে দেখতে পেয়ে হ্যারির বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে।

ট্রাফিক আলোর সঙ্কেতে গাড়িগুলো গতি কমাতেই ও রাস্তা পেরিয়ে জুলির পেছনে ছুটল। সাদা পোষাকের ডিটেকটিভটা হ্যারিকে ওর পেছনে আসতে দেখে ভাবল এ আবার কোত্থেকে এল, কি চায়? একটু পিছিয়ে ও হ্যারিকে এগিয়ে যেতে দিল।

হ্যারি তখন এতই ব্যস্ত, যে ডিটেকটিভকে, ও দেখতেই পেলনা। জুলি রাস্তা পেরোবে বলে দাঁড়িয়ে আছে, তখন হ্যারি এসে ওকে ধরে ফেলল।

টুপি তুলে বলল, হ্যালো আমি একটু কথা বলতে চাই। আমাদের প্ল্যান বদলে গেছে।

জুলি রেগে গিয়ে বলল, আমি কথা বলতে চাই না, চলে যাও।

হ্যারি ওর হাত ধরে বলল, কাজের কথা। গোয়ার্তুমি কোর না। কোণেই একটা ক্লাব আছে। ওখানে বসে কথা বললে কেউ দেখতে পাবে না।

জুলি ইতস্ততঃ করলো। ভাবলো, প্ল্যান যদি সত্যিই বদল হয়ে যায়, তবে ওয়েসলিকে তা জানাতে হবে।

–ঠিক আছে। রেগেই বলল। রিজেন্ট স্ট্রীট ধরে ওরা এগোল।

জুলি ভাবল হ্যারির সঙ্গে দেখা হয়ে ওর সন্ধ্যেটা মাটি হল। ভেবেছিল একটা সিনেমা দেখে পার্কওয়েতে ফিরবে।

হার্লেকুইন ক্লাব এখন খালি। ওরা ঢুকল। হ্যারি জানতে চাইল জুলি কি খাবে।

–কিছু না। তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না আমি। জুলির সংক্ষিপ্ত জবাব।

হ্যারি ডবল হুইস্কির অর্ডার দিল।

জুলির মুখোমুখি বসেও জিজ্ঞেস করল, জুলি তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর এখনো রেগে নেই? এ ঝামেলার কাজটায় জড়িয়ে পড়ে, এখন তো আর পেছতে পারব না?

জুলি অধৈর্য হলে উঠল।

বলেছো কাজের কথা বলতে চাও, কি বলার আছে বল, আমাকে যেতে হবে।

হ্যারি এতক্ষণে জুলির শীতল চাহনি, অচেনা চাহনি ভাল করে দেখল। দেখে হ্যারি বুঝল জুলি আর ওকে ভালবাসে না। ও কেমন চুপসে গেল।

ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত গলায় বলল, কাজটা হলে তোমাকে ওখানে রেখে আসাটা আমার ভাল লাগছে না। আমার মনে হচ্ছে ও ব্যবস্থাটা নিরাপদ নয়। তার চেয়ে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো চুরির পর। কোথাও গা ঢাকা দেব আমরা। তারপর জাহাজে চড়ে আমেরিকা পালার।

জুলি এমনভাবে ওর দিকে তাকাল, যেন হ্যারি পাগল হয়ে গেছে।

ধারালো গলায় জুলি বলল, ওখানে যেতে আমি ভয় পাই না। তবে কাল রাতেই তো আমি তোমাকে বলে দিয়েছি যে তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি।

হ্যারি একটু সামনে ঝুঁকে বলল, দেখ জুলি, আমি স্বীকার করছি, আমিই এ ফাঁদে তোমায় ফেলেছি। আমি শুধু খানিকটা টাকা চাই। তারপরই আমি সোজা রাস্তায় চলব, ভাল হয়ে যাবো। সত্যি বলছি জুলি, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না।

হ্যারির কথাগুলো নয়, যে ভঙ্গীতে ও কথাগুলো বলল, তাতে জুলির মনে গভীর ভাবে একটা ধাক্কা লাগলো।

না। চেঁচিয়ে উঠল জুলি। তোমার সঙ্গে আমি জীবনেও যাব না। কিন্তু হ্যারি আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। সময় থাকতে সরে যাও। আমি জানি একাজ করে পার পাবেনা তুমি। দোহাই তোমার একাজ কোর না।

হ্যারি ওকে বাধা দেবার আগেই ও লাফিয়ে দরজার দিকে ছুটল।

হ্যারি একমিনিট মূঢ়ের মত তাকিয়ে থেকে, তারপর চেয়ারটাকে লাথি দিয়ে পেছনে ঠেলে জুলির পেছনে ছুটল। সিঁড়িতে জুলিকে ধরে ফেলল।

জুলি? কি বলছ তুমি? কি জান?

ও হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলে হ্যারি ওকে আরো শক্ত করে ধরে ওর চোখে চোখ রাখল।

ওকে ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি নিশ্চয় বলে দাওনি সব। বলে দিয়েছ? পুলিশকে বলে দিয়েছ?

না। আমি ভয় পাচ্ছি শুধু। এ কাজ বেজায় বিপদের। আমার শুধু মনে হচ্ছে একাজ সফল হবে না। জুলি কথাগুলো বলে গেল।

হ্যারির সন্দিগ্ধ চোখ দুটো ওর মুখে কি যেন খুঁজেই চলেছে।

জুলি বলল, যেতে দাও আমায়। শুনছ? যেতে দাও আমাকে ছেড়ে দাও।

সিঁড়ির নিচ থেকে একটা কঠিন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কি মিস? লোকটা কি আপনাকে জ্বালাতন করছে?

ওরা নিচের দিকে চেয়ে দেখল বিশালাকার একটা লোক কপালটাকা টুপি আর বর্ষাতি পরে ওদের দিকে চেয়ে আছে। হ্যারি দেখেই চিনতে পারলো ও সেভিল-রো পুলিশ ফাঁড়ির সাদা পোশাকি ডিটেকটিভ। ও তাড়াতাড়ি জুলিকে ছেড়ে দিল।

–ঠিক আছে। বলে ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামলো

ডিটেকটিভ হ্যারিকে বলল, একটু খেয়াল রেখো ভায়া। নইলে আমার সঙ্গে তোমাকে একটু বেড়াতে যেতে হবে।

হ্যারি বলল, খেয়াল থাকবে।

হ্যারি ক্লাবে ফিরে গেল।

.

হ্যারি যখন জুলিকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করছিল যে ও তাকে ভালবাসে, মিসেস ফ্রেঞ্চ তখন থিওর সঙ্গে চুরির বিষয়ে শেষ খুঁটিনাটি আলোচনা করে নিচ্ছিলেন। জানলার পাশের চেয়ারে বসেছিলেন উনি।

ওঁর মুখোমুখি ইজিচেয়ারে গা ঢেলে পড়েছিল থিও।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ব্যবস্থা করে ফেলেছেন চুরির জন্যে কোন্ গাড়ি ব্যবহার করা হবে। সহসা দুজনের মাঝে একটা নীরবতা। শীতল চাউনিতে বাইরের দিকে চেয়ে মিসেস ফ্রেঞ্চ যেন কি ভাবছেন।

হঠাৎ মুখ না ফিরিয়েই মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, আর কিছু নেই তো?

থিও হাসলো।

ঐ যে মেয়েটা জুলি কি যেন পদবী ওর! বলে ধুলোমাখা জুতার দিকে চিন্তাকুল চোখে চেয়ে বলল, হ্যারি ওতে মজেছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ স্বগতচিন্তা করছেন, কে জানে ও আবার সব ফাঁস করে দেবে না তো? মাথা পিছু আট হাজার টাকা করে পড়বে। ও যদি কথা বলে...।

থিও ধারালো গলায় বলল, আবার ঐ কথাগুলো বলবে না কি? বলেছি আমি ওকে ঠিক করে দেব। আমি...।

থিও কি যেন ভেবে আবার বলল, এখন হ্যারি ওর প্রেমে মজেছে, আমার অন্যের সাহায্য দরকার।

–কি ধরনের সাহায্য?

থিও ওয়েস্টকোটের বোম খুলে হাত ঢুকিয়ে পাঁজরা চুলকোতে চুলকোতে বলল, আমার মনে হয়, হ্যারি কাজ হাসিল করে, লিফটে ফারগুলো আমাকে নামিয়ে দিয়ে তারপর মেয়েটাকে বেঁধেহেঁদে, গয়নাগুলো নিয়ে ও সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামলো। আমি ফারগুলো গাড়িতে রাখলাম। গাড়ি কিন্তু চালাবে ডানা। মানে তিনজনের হাতে কাজটা হবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ সবকিছু বুঝেও না বোঝার ভান করে বললেন, এতে ডানাকে জড়াতে চাই না আমি। তুমি তো আগেও গাড়ি চালিয়েছো?

থিও ওঁর দিকে তাকিয়ে রেগে বলল, কি হয়েছে তোমার? ঐ মেয়েটাকে আমাকে দেখতে হবে না? বলে আবার পাঁজরা চুলকোতে লাগল।

–কেমন করে দেখবে?

চাকরদের লিফটে আমি উঠে আসবো। হ্যারি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। তারপর মেয়েটার বাঁধন খুলে আলমারীতে ঢুকিয়ে দেব। পুলিশ ভাববে ও চুরি করতে গিয়ে আটকা পড়ে মারা গেছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন।

–সে ত খুন হবে থিও। কথাটা কেমন আনমনে বললেন মিসেস ফ্রেঞ্চ।

থিও নাক সিঁটকাল। নোংরা নখ দিয়ে নাক খুটল।

দুর্ঘটনা। যাই হোক না কেন, দেখে দুর্ঘটনাই মনে হবে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, আমি বলছি না আইডিয়াটা খারাপ। আর ও যে মুখ খুলবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আমি খুনে মত দেব না থিও।

থিও কথাটাকে কোন আমলই দিল না। মোচোনো টুপিটার ভেতর থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সব থেকে কম নোংরা সিগারেটটা বেছে নিয়ে ধরালো।

নাক দিয়ে লম্বা ধোয়া ছেড়ে থিও বলল, পয়সার খানিকটা আমি খরচ করতে চাই। তুমি যা বলেছিলে–ও যদি মুখ খোলে, তবে খরচ করার সময়ই পাব না। তুমিও না, ডানাও না।

–হ্যারিও না।

–হ্যারির কি হয়, তা নিয়ে মাথা ঘামাবো না। আমি ওকে দেখিয়ে দিতে।

–আমি এসব কথা শুনতে চাই না। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

–আমি লজ্জিত। থিও আবার পাঁজরা চুলকোতে শুরু করলো।

দীর্ঘ বিরতির পর মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, ও অবশ্য আমেরিকা চলে যাবে।

থিও মুখ বাঁকালো।

–হ্যারির কথা ভুলতে পারছে না। হচ্ছে মেয়েটার কথা।

মিসেস ফ্রেঞ্চ মাথা নাড়ালেন।

–আমি ওর কথা শুনতে চাই না। খুনে আমার মত নেই।

থিও মিসেস ফ্রেঞ্চের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। তারপর অনায়াসে বলে উঠলো, বলছি না, জিনিষটা দুর্ঘটনা! আবার চুলকোতে লাগল।

মিসেস ফ্রেঞ্চ বললেন, আমি আর ও নিয়ে কথা বলতে চাই না। তুমি হ্যারি আর ডানার চেয়ে বেশি পাবে। আরো পনেরোশো।

থিওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দু–হাজারই করে দাও ওটা। পয়সা উঠে যাবে।

পনেরো শ। হ্যারিকে তো আমাকেই বুঝিয়ে বলতে হবে।

–না। কাজ হাসিল হলে তবে টাকা ভাগ হবে। তখন ও আপত্তি করতে পারবে না। তখন তো সব খতম।

বেশ দু–হাজার।

–ডানা গাড়ি চালাবে তো? থিও–জিজ্ঞেস করলো।

জানি না কেন তুমি গাড়ি চালাতে চাইছে না। তবে তুমি যদি বল যে চালাতে পারবে না, তবে ডানা চালাবে।

–কেন কথা ঘোরাচ্ছে। আমরা তো সাক্ষী রেখে কাজ করছি না। তুমি কি চাও না আমি কাজটা করি?

–আমি তো বলেছি মেয়েটার মুখ বন্ধ রাখার এটাই একমাত্র পথ। কিন্তু আমি এও বলেছি খুন আমি সমর্থন করি না। একথা যা এখন।

–আমি দু–হাজার উপরি পাচ্ছি, ডানা গাড়ি চালাচ্ছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ মাথা নাড়লেন।

–ঠিক আছে। ছেড়ে দাও। ও নিয়ে আমিই ভেবে দেখব।

থিও বেরিয়ে গেল। মিসেস ফ্রেঞ্চ অনেকক্ষণ জানলার বাইরে চেয়ে রইলেন। ডানা ঘরে এসে ঢুকল।

থিও চলে গেছে? একা বসে আছো?

মিসেস ফ্রেঞ্চ হু বললেন।

–সব ঠিকঠাক হয়ে গেল? ডানা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

–সব।

ডানা মার টেবিলের কোণে বসে হাঁটুর ওপর যেখানে গার্টার চেপে বসেছে, সেখানকার লাল জায়গাটা ঘষতে ঘষতে বলল, ঐ হল্যান্ড মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।

মিসেস ফ্রেঞ্চ ডানার দিকে না তাকিয়েই বলল, তোমাকে ওর কথা ভাবতে হবে না। তোমায় গাড়ি চালাতে হবে।

ডানার ভুরু কুঁচকে গেল।

–কেন? থিও চালাবে এরকমই কথা ছিল না?

মিসেস ফ্রেঞ্চ উঠে দাঁড়ালেন।

–থিও বলছে তার চেয়েও জরুরী কাজ ওর আছে। আমি জানি না ওকে কি করতে হবে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি, আমি চাই না যে তুমি কিছু জিজ্ঞেস কর।

–ডানা একমুহূর্ত ফ্যাকাশে মুখে মার দিকে চেয়ে রইল।

–মা, তুমি নিশ্চয় বলছ না?

–চুপ কর। মিসেস ফ্রেঞ্চ আবার জানলার দিকে মুখ ফেরালেন।

.

পরদিন বিকেলে ওয়েসলির আসার কথা শুনে ডসন কনস্টেবলকে মাথা নেড়ে ওয়েসলিকে ভেতরে আনতে বলল।

ওয়েসলি ঘরে ঢুকতেই ডসন চেয়ার পিছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার ঠিক পাশেই চেয়ার আছে মিঃ ওয়েসলি। তারপর কনস্টেবলকে ইশারা করতে চেয়ারটা ওয়েসলির হাঁটুর পেছনে ঠেকাল, ওয়েসলি বসল।

ওয়েসলি বললেন, তাহলে আজ সন্ধ্যায় ওদের ধরবার জন্যে আপনি প্রস্তুত থাকছেন। ভাবলাম শেষ অবধি যদি কিছু করার থাকে, জেনে যাই।

–সব ঠিক আছে, ডসন বলল, ওয়েসলি চিন্তাকুল মুখে চাইল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কোন চিন্তা নেই।

ডসন মনে মনে ভাবল, এই লোকটা হল্যান্ড মেয়েটার মধ্যে কি দেখেছে? মেয়েটা দেখতে ভাল, সে আমি বলবই, কিন্তু মেয়েটার মধ্যে আর কিছু তো নেই। কিন্তু এ লোকটার তো প্রচুর পয়সা, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি আভিজাত্য আছে। ওদের দুজনের মধ্যে কোন মিলই নেই। তবে ব্যাপারটা কি?

সেই সাদা পোশাকী ডিটেকটিভটির কথা শুনেই ওর কৌতূহল হয়েছিল। ক্লেগ জুলির পিছু নিয়ে বুঝেছিল ওদের দুজনের মধ্যে একটা ব্যাপার ঘনিয়ে উঠেছে।

ওয়েসলি ইতস্ততঃ করে বললেন, তাহলে আপনারা সব হাতের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আমি স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটারে যাচ্ছি। একমাত্র থিয়েটারে গেলেই আমি আমার স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারবো। তবে আমি খুবই উদ্বিগ্ন আছি, দেখবেন আজ রাতে যা ঘটতে চলেছে তার বিন্দুমাত্রও যেন উনি টের না পান। তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। একটু থেমে অধীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন ওয়েসলি, আপনি মনে করেন জুলির কোন ক্ষতি হবে না, তাই তো?

না। জুলি বলেছে ওদের প্ল্যান, চুরির পর ওকে বেঁধে রাখা। যাই হোক, আমরা কাছাকাছিই থাকবো। উনি যেন শুধু চেঁচান।

–আপনার পুলিশ ঠিক কোন্ জায়গায় থাকবে?

হলে দুজন, পেছনের গলিতে দুজন, আর ফ্ল্যাটের ঠিক বাইরে সিঁড়ির মুখে দুজন, ছাতে দুজন। ওরা যেই বাড়িতে ঢুকবে আমরা কোন ঝুঁকি না নিয়ে বাড়িটা ঘিরে ফেলবো।

ওয়েসলি মাথা নাড়লেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে সব ঠিকই আছে। আমরা হিপোডড্রাম থিয়েটারে যাচ্ছি, মনে হয় না আমাকে আপনাদের দরকার হবে। তবুও আটটা চল্লিশে ইনটারভ্যালের সময় আমি আপনাকে ফোন করব। তাতে হবে তো?

হওয়া উচিত। তাহলে চিন্তার কিছু কারণ থাকবে না।

ধন্যবাদ। আপনার নিশ্চয় অনেক কাজ, আর দেরী করাবো না আপনাকে। ওয়েসলি হাত বাড়ালেন।

ডসন হাত ঝাঁকিয়ে বলল, ব্যস্ত তত থাকতে হবেই স্যার। তবে এ কাজটা আমাদের পক্ষে বেশ ভাল। সব সময়ে আমরা ভেতর থেকে এমন খবর পাই না, বুঝলেন?

–দেখনে, আপনাদের হাত ফসকে ওরা যেন না পালায়।

–সে ভয় নেই। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

–আপনারা বোধহয় মিস হল্যান্ডকে সাক্ষী দেওয়াতে চাইবেন। যদি তা পারেন–সাক্ষী না দিতে হয় তবে খুশী হবো। ওর বিষয়ে যত কম প্রচার হয় ততই ভাল। সেটা কি খুব প্রয়োজন হবে?

ডসন ভাবল, এই কি ওঁর আসার উদ্দেশ্য? মুখে বলল, যদি ধরতে পারি তাহলে মনে হয় না ওকে দরকার হবে। অবশ্য আপনাকে দরকার হবে।

–তা ঠিক আছে। দেখুন আপনারা তো জানেনই মেয়েটা ভাল পরিবেশ থেকে আসেনি। আমি চাই ও যাতে নতুন জীবন শুরু করতে পারে। দলটা ধরা পড়ায় ওর হাত আছে চাউর হয়ে গেলে ওর পুরনো পরিচিতরা ওকে বিপদে ফেলতে পারে।

–তা পারে। বাধ্য না হলে ওকে আমরা ডাকব না স্যার।

ওয়েসলি মাথা নাড়লেন।

উনি নড়বার কোন লক্ষণ দেখালেন না। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, ভালো। ইন্সপেক্টর, মিস হল্যান্ডের বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে। আপনি নিশ্চয় আমার কথা বুঝতে পারছেন। এ সব চুকেবুকে গেলে আমি ওর দায়িত্ব নেব। তাই বলছিলাম, সামান্য জানাজানি হলেও লজ্জায় পড়তে হবে।

ডসন লজ্জিত হয়ে বললেন, এ বিষয়ে আমার কি বা বলার থাকতে পারে?

ওয়েসলি হেসে বললেন, তা আমি জানি। এ-সব মিটে গেলে আমি ওর দায়িত্ব নেব, আমি দেখব ও যেন আর কোন ঝামেলায় নিজেকে না জড়ায়।

ডসন নিরুত্তাপ গলায় বলল, ও ঝামেলায় না জড়ালে আমাদেরও খোঁজ নেওয়ার দরকার পড়বে না। এসব কথা আমাকে বলার দরকার ছিল না, স্যার।

–কিন্তু ইন্সপেক্টর, আমি চেয়েছিলাম আপনি প্রকৃত ঘটনাটা জানুন। আশা করি, ভবিষ্যতে আমায় কোন ডিটেকটিভ অনুসরণ করবে না। যদি করে আমি ব্যবস্থা নেব। ওয়েসলি কঠিন গলায় বললেন।

ডসন মুখ চমকে ভাবল, ধরে ফেলেছে। নিশ্চয়ই হতভাগা মেয়েটা ক্লেগকে দেখে ফেলেছে। আর সেজন্যই এত খুলে মেলে সব বলতে এসেছে।

ডসন ধীরে নিচু গলায় বলল, ওটা একটা দুর্ঘটনা মনে করে মাপ করে দিন। আমরা মিস হল্যান্ডকে পাহারা দিচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা অহেতুক ব্যাপার এসে গেল।

তাই মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে যদি আপনার লোক আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে, তাকে চলে যেতে বলবেন।

–আজ সন্ধ্যার পর আশা করি মিস হল্যান্ডকে আর পাহারা দেবার দরকার পড়বেনা। ডসন বলল।

–নিশ্চয়ই না। ওয়েসলি হাসলেন, আজ সন্ধ্যায় কোন্ সময়ে ফোন করবো আপনাকে? আপনার লোক কি আমায় ট্যাক্সি পর্যন্ত নিয়ে যাবে?

–ওয়সলি বেরিয়ে গেলেন।

ডসন ভাবতে লাগল, এ-সব লোককে আমি চট করে ঘাঁটাতে চাই না। ওঁর ডাক নরম, কামড় সাংঘাতিক। ওয়েসলির ট্যাক্সিটা চলে যেতে দেখে ভাবল, তবে লোকটা ভাল, হিম্মত আছে। ভি, সি পেয়েছে, এদিকে অন্ধ। যদি মেয়েটাকে নিয়ে মজা পায় তো পাক না।

ও আবার কাজ করতে টেবিলে ফিরে এলো।

.

জুলি ঘরে পায়চারি করছিল। দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে ও চমকে উঠলো। ওয়েসলি সান্ধ্য পোষাকে ঢুকল।

দরজা বন্ধ করে উনি হাসলেন।

–ভয় পেয়েছ জুলি? বুকে হাতুড়ি পিটছে?

জুলি কাতরভাবে মাথা নাড়াল।

উনি ভরসা দিলেন, এখনি সব চুকে যাবে। আমি সঙ্গে থাকতে পারলে ভাল হত, কিন্তু এ কাজটা তোমার একাই করতে হবে।

জুলি বলে ফেলল, আমার...আমার শুধু হ্যারির কথা মনে হচ্ছে। কাল ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও আমাকে ওর সঙ্গে আমেরিকা নিয়ে যেতে চাইল। বলছিল ও আমায় সত্যিই ভালবাসে। আমিও দেখলাম সে কথা সত্যি।

ওয়েসলির মুখে কোন কথা ফুটল না।

ধীরে ধীরে বললেন, তাই বুঝি? পুলিশ ওকে ধরবে তোমার খারাপ লাগছে? কিন্তু গ্লেবের মত লোক তোমাকে কোনদিন সুখী করতে পারবে না। আজ বা কাল ও নিজেকে ঝামেলায় জড়াবেই আর ওর সঙ্গে তুমিও ফাসবে। তোমার এখন নিজের কথা ভাবতেই হবে।

জানি। কিন্তু যে আমাকে ভালবাসে তার সঙ্গে এরকম করাটা নীচতা। এখন মনে হচ্ছে যদি ওকে সাবধান করে দিতে পারতাম...যদি থিও না থাকত...।

ওয়েসলি কথা এড়িয়ে বললেন, এই নাও এটা। দেখ এতে মনটা একটু হালকা হয় কিনা। মুখ ফিরিয়ে জুলি দেখল ওঁর প্রসারিত হাতে একটা চেকবই।

এটা তোমার। আড়াইশো পাউন্ড জমা দিয়ে তোমার নামে ব্যাঙ্কে একটা খাতা খুলেছি। প্রতি তিনমাসে আড়াইশো পাউন্ড করে জমা দেব আমি। কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে সইটা করে আসবে। তারপর তুমি টাকা তুলতে পারবে।

জুলি চিরকালের আকাঙ্খিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের চেকবই পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বলল, আমার জন্যে? আড়াইশো পাউন্ড?

–আমি তো তোমায় বলেছি বছরে হাজার পাউন্ড দেব। এই তার শুরু।

–ও। আসলে এটা তুমি দিচ্ছে যাতে আমি মুখ বন্ধ রাখি। তুমি আমায় পছন্দ করো না।

ওয়েসলি আস্তে আস্তে বললেন, তোমার চুপ থাকার গুরুত্ব অনেকখানি। সেজন্য আমি তোমায় টাকা, পোষাক, বাড়ি, আনন্দ যা চাও দেব। কিছুতেই মুখ খুলল না।

–খুলব না। জুলি বলল, চেকবইটা হাতে চেপে ধরল।

আর হ্যারির প্রতি যদি এখন দুর্বলতা দেখাও তো পরে অনুশোচনা করতে হবে। একটু থেমে উনি বললেন, জুলি, এখন আমায় যেতে হবে। ভয় পেও না। শেষ অবধি সামলে নিতে পারবে তো?

জুলি মনে জোর এনে ভাবল, আমাকে পারতেই হবে। হ্যারিই একদিন আমাকে বলেছিল, টাকা মানে ক্ষমতা। টাকা কোথা থেকে, যেমনভাবে পেলাম, ভাবতে চাই না। যে কদিন বাঁচব ফুর্তি করে নেব। তারপর তো কবরের পোকা...।

এ তো হ্যারিরই জীবনদর্শন। আজ যদি জুলির অবস্থায় হ্যারি পড়তে ও ইতস্ততঃ করত না।

–হ্যাঁ আমি পারবো। জুলি বলল।

ওয়েসলি চলে যেতেই ওর হাত পা ভয়ে কাঁপতে লাগল। হাতের মুঠো শক্ত, ঘড়ির কাটার দিকে চেয়ে বসে আছে। আর চল্লিশ মিনিট বাকি হ্যারি আসতে। জুলির স্নায়ুগুলো পাকিয়ে ধরতে লাগল।

এই একই উত্তেজনা পার্কের গাছের ছায়ায় অন্ধকারে হ্যারি আর থিওর মধ্যেও। আলোকোজ্জ্বল ফটকটা ওরা লক্ষ্য রাখছিল।

হ্যারি উত্তেজনায় অস্থির হয়ে একবার এ পায়ে, আর একবার ওপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর ঘনঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে।

থিওর কিছুই হয়নি। ও একটা হাত পকেটে পুরে, টুপিটা মাথার পেছন দিকে হেলিয়ে গাছে হেলান দিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে।

হ্যারি সহসা বলল, কটা বাজে?

–সাতটা বিশ। থিও ঘড়ির উজ্জ্বল কাঁটা দুটো দেখে, হ্যারির দিকে ঘেন্নার চোখে তাকাল।

–ওদের তো বেরিয়ে যাওয়া উচিত। ওরা কি চলে গেছে?

না, হতে পারে না। তাড়াহুড়ো করছ কেন? আটটার আগে তো আমরা কিছু করতে পারছি না।

হ্যারি বিড়বিড় করে বলল, বুড়ি কেন ডানাকে এর মধ্যে টানল, জানিনা। কাজটা তোআমাদের দুজনের দ্বারাই হয়ে যেত।

অন্ধকারে থিও প্রেতের মত হাসল।

বলল, ঠিকই করেছে। গলিতে অনেকক্ষণ গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ দেখে ফেলতে পারতো। এই ভাল হয়েছে। আমায় কেউ দেখতে পাবে না। আমি পেছনে যাব, ফারগুলো নেব, ডানা গাড়ি নিয়ে আসবে, ফারগুলো ভেতরে রাখবো, ও চলে যাবে গাড়ি নিয়ে। এ তত ভাল বুদ্ধির কাজ।

হ্যারি আপত্তি জানাল। পরিকল্পনার পরিবর্তন ওর মনপুতঃ হয়নি।

–ঐ যে যাচ্ছে। থিও আঙুল তুলে দেখাল।

ওরা দেখল ব্লানশ আর ওয়েসলি ট্যাক্সিতে উঠল। গাড়ি চলে গেল।

হ্যারি সিগারেট ধরাল। বলল, খেল শুরু হল। আমি ওখানে যেতে চাই। অপেক্ষা করে করে শরীরে ব্যথা ধরে গেল।

থিও চেঁচিয়ে বলল, ভয় পেয়েছো?

চুপ কর বাঁদর। হ্যারি গর্জাল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে থিও ঘড়ি দেখে বলল, আমার যাবার সময় হলো। পাঁচ মিনিট বাদে তুমি এসো। জেলে দেখা হবে। বলে, ঘষটে ঘষটে ও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হ্যারি আঙুল মটকে ভাবল, জেলে দেখা হবে। এ ধরনের বদরসিকতা?

হ্যারি এখন জুলির কথা ভাবছে। ও ঠিক করেছে কাজ হাসিল করার পর জুলির হাজার আপত্তি সত্ত্বেও ও জুলিকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবে।

থিও এতক্ষণে বাড়ির পেছনের গলিতে পৌঁছে গেছে ধরে নিয়ে হ্যারি কলার তুলে এগোল। ধীর পায়ে পার্কের ঘাসের সীমানা পেরিয়ে পার্কওয়ের দিকে এগোল। বুক ধড়াস ধড়াস করছে, গলা শুকিয়ে গেছে।

ডিটেকটিভ ডসন আর দুজন সাদা–পোশাকী ডিটেকটিভ ওকে নজরে রেখেছিল।

বিশাল লবিতে ঢুকে ও দারোয়ানের আফিসে গেল।

–মিসেস গ্রেগরির ফ্ল্যাট খুঁজছি। বলতে পারেন কোথায়?

জুলি ওকে বলেছিল ওপরতলার ফ্ল্যাটটা মিসেস গ্রেগরীর। হ্যারি খবরটা স্মৃতিপটে লিখে রেখেছিল।

মিসেস গ্রেগরী?

–হ্যাঁ স্যার।

–ওপরে। ডানদিকের লিফটা নিন। জানি না উনি আছে কিনা, দেখব ফোন করে?

উনি জানেন আমি আসব। হ্যারি তাড়াতাড়ি লিফটের কাছে গিয়ে বোতাম টিপল।

অপেক্ষা করতে করতে ওর একটা আতঙ্কের অনুভূতি হলো, মনে হল ওর ওপর কেউ যেন নজর রেখেছে।

ওর ঘাম ঝড়তে লাগল। রুমাল দিয়ে মুছল।

ওপরতলায় পৌঁছে ঝট্ করে লবিটা দেখে নিল। জনশূন্য ভো ভো। দারোয়ান অফিসে ফিরে গেছে।

লিফট থেকে বেরিয়ে ও দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওয়েসলির ফ্ল্যাট যে তলায় সেখানে পৌঁছাল। নির্জন বারান্দাটা দেখে ও বেল টিপল।

চূড়ান্ত যন্ত্রণায় দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত দেরী হল জুলির দরজা খুলতে।

ওর দিকে চাইল জুলি, ভয়ে ওর মুখ সাদা, চোখ বিস্ফারিত।

–সব ঠিক আছে জুলি? হ্যারি তড়িঘড়ি ভাব দেখাল, চল যাই।

কিন্তু জুলি হাঁ করে চেয়ে রইল। হ্যারি ওভারকোট পরেছে, কালো সিলকের স্কার্ফে চিবুক জড়ানো।

–হ্যারি, একাজ কোর না। জুলি পিছিয়ে গেল।

হ্যারি ঠেলে ওকে জুলির শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

হ্যারি নিজে অস্থির হয়েও ওকে বলল, ঠাণ্ডা হও, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। ঢুকব আর বেরোব। বুঝলে, যত তাড়াতাড়ি পার, আলমারীটা খোল।

ভয়ে সিঁটিয়ে রইল জুলি। ওর মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এসে পড়বে। ও নড়তেই পারল না, মরার মত চেয়ে রইল।

হ্যারি বলল, তাড়াতাড়ি কর। দোহাই তোমার কথা বোল না। হতচ্ছাড়া আলমারীটা খোল। হ্যারি অস্থির হয়ে জুলিকে ঝাঁকাল।

–কিন্তু হ্যারি–জুলি ডুকরে উঠল।

হ্যারি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো, বেরোলে তবে কথা হবে। খোল এটা! লেপটাকা দেওয়ালের দিকে ও ঠেলে জুলিকে নিয়ে গেল, অ্যালার্ম বন্ধ কর। বিছানার পাশে একটা ঘণ্টা আছে, বন্ধ কর।

হঠাৎ জুলির মনে হল, হ্যারি যদি ফার না নেয়, তাহলে পুলিশ ওকে ধরতে পারবে না। ও দিব্যি বলতে পারবে, হ্যারি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

হ্যারি শোন, তুমি কিছু নিও না। আমি তোমার সঙ্গে যাব, তুমি যদি এখন চলে যাও।

হ্যারি ঝট করে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। ওর শিরা, স্নায়ু, সব ছিঁড়ে যাচ্ছে।

হ্যারি চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ হাঙ্গামার অ্যালার্ম বন্ধ কর। কথা বোল না।

–কিন্তু হ্যারি তুমি বুঝছো না কেন? ... জুলির কথার মাঝখানে চাপা গলায় হ্যারি দিব্যি গেলে জুলির হাত চেপে ধরে জুলির মুখে ঠাস করে একটা চড় মারলো।

রেগে গিয়ে হ্যারি বলল, আলমারী খোল। মাথা ঠাণ্ডা করো গাধা।

জুলি বুঝল যে ভয় পেয়েছে বলেই হ্যারি ওকে মেরেছে।

জুলিকে ভালবাসে বলেও যদি ও চড় মারতে পারে, তাহলে ওর ভালোবাসার মূল্যটা কি?

–ঠিক আছে। তারপর বোল না, আমি তোমায় সাবধান করি নি। রিক্ত গলায় জুলি বলল।

হ্যারি দেখল দশ মিনিট হলো ও ঢুকেছে। এখনো আলমারি খোলা হলো না।

তাড়াতাড়ি কর। রুদ্ধশ্বাসে, আতঙ্কে হ্যারি বলল, বেরিয়ে পালাতে হবে।

জুলি যন্ত্রচালিতের মত বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে অ্যালার্ম বন্ধ করল। বাথরুমে গিয়ে দ্বিতীয় অ্যালার্মটাও বন্ধ করলো। হ্যারি, ওকে তাড়া লাগাল।

কি করছে তা না বুঝেই জুলি আলমারীটা খুলল। ইস্পাতের দরজা খুলল, ফোটো ইলেকট্রিক সেলের আলোটা জুলি বন্ধ করতেই হ্যারি ঝাঁপিয়ে পড়ে ফারগুলো পাঁজা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জুলি শুনতে পেল ও রান্নাঘরের দেওয়াল সরাচ্ছে বোম টিপে, চাকরদের লিফটটা ওখানে। হঠাৎ জুলির মনে হল ও যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে। চেয়ারটা ধরে নিজেকে সামলালো।

হ্যারি আবার এসে আরেক পাঁজা করে বেরিয়ে গেল। তড়িতের মত ছোটাছুটি করছে ও। জুলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। জুলিরও কিছু করার নেই। ও ভাবছে এক মুহূর্তেই পুলিশ আসবে আর হ্যারির খেলাও শেষ হবে।

তারপর হঠাৎই বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ মর্মভেদী আর্তনাদে সারা ফ্ল্যাটটা হা হা করে ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

জুলি দরজায় এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে উঁকি মারলো।

জুলি দেখল, দরজার গজখানেক ভেতরে হ্যারি দাঁড়িয়ে আর ওর পায়ের কাছে কি যেন একটা, হ্যারির চোখ সেদিকে। হ্যারির জন্যে জিনিষটা জুলি দেখতে পাচ্ছে না। কাছেই একটা অটোমেটিক পিস্তল পড়ে আছে, নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

–হ্যারি! জুলি আর্তনাদ করলো।

হ্যারি যেন আঁতকে উঠে সামনের দরজাটা বন্ধ করলো। ও নড়তেই জুলি দেখল, মেঝেতে পুতুলের মতো একটা শরীর পড়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে জুলি দেখল শরীরটা ব্লানশের।

ব্লানশের মুখের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ওর উজ্জ্বল চুল ঘিরে রক্তবলয় রচনা করেছে দেখে জুলি আর্তনাদ করলো।

সামনের দরজায় ভীষণ আঘাতের শব্দ। ক্যাচ ক্যাচ করে উঠলো, খুলল না।

জুলি শিউরে পিছিয়ে এল।

দুহাতে হ্যারিকে ঠেকাতে চেষ্টা করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি ওকে গুলি করেছ, সরে যাও হ্যারি।

হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি বিশ্বাস কর, আমি গুলি করি নি। আমি রান্নাঘরে ছিলাম। জীবনে বন্দুক সঙ্গে রাখি না জুলি। তোমাকে পুলিশের কাছে বলতে হবে, আমি...আমি একাজ করিনি।

তারপর সামনের দরজা খুলে তিনজন পুলিশ অফিসার তেড়ে এল।

হ্যারি জুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে এক পা নড়ার আগেই ওরা হ্যারিকে ধরে ফেলল। অনেকগুলো হাত ওর ধস্তাধস্তির চেষ্টা ব্যর্থ করল।

তারপর সব অন্ধকার। জুলি যেন কোন খাদের গহন অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

থিও যখন চাকরদের লিফট চালিয়ে ওপরে উঠছিল তখন ও গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। তখনি ও পলকা ব্রেকটা কষে থামায়। লিফট তখনি থেমে যায়। হ্যারি লিফটে ঢোকার জায়গাটা খুলে রেখেছিল। সেই খোলা দরজার একটু নিচে থিওর লিফটা থামে। মুখটা বের করে রান্নাঘরের ছাদটা দেখতে পায়।

জুলির উন্মত্ত, ভীত আর্তনাদ, ফ্ল্যাটের সদর দরজা ভাঙার আওয়াজ পেল। ও বুঝল কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

লিফটের ভেতরে দড়ির যে অংশটা আছে, সেটা টেনে লিফটা নামানো যায় বহু কষ্টে। থিওর দড়ি টেনে টেনে লিফট ওপরে তুলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তবু ঐভাবে উঠল, কেননা জুলির মুখ বন্ধ করা প্রয়োজন।

এখন ওপরে পৌঁছবার একটু আগেই গোলমাল বাঁধল।

সহসা ও শুনতে পেল হ্যারির শঙ্কিত আওয়াজ। আমি একাজ করিনি, ওটা আমার বন্দুক নয়, আমি শপথ করে বলছি।

থিওর মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

ও ভাবল তবে কেউ গুলি খেয়েছে। কেউ দেখে ফেলার আগেই অত্যধিক ব্যস্ত হয়ে দড়িটা টানার আগেই ব্রেক আলগা করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল গতিতে লিফটা নামতে লাগলো। থিও ব্রেকটা প্রাণপণে আঁচড়ে ধরে বসে রইল। কিন্তু পেছনের গলির ডিটেকটিভ দুজন দেখল অন্ধকারের ভেতর থেকে লিফটা নীচে আছড়ে পড়লো আর থিও ভয়ে ঝাঁকিয়ে উঠলো।

ছুটে গিয়ে থিওর পাণ্ডুর মুখে টর্চ ফেলল। যখন ওরা থিওকে ছুঁল থিও এমন আর্ত চীৎকার করে উঠল, যে দুজনে চমকে পিছিয়ে গেল।

লম্বা লোকটি বলল। ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা কর। আমরা অ্যাম্বুলেন্স আনছি।

অন্য লোকটিকে প্যাসেজ ধরে ছুটে যেতে দেখে থিও বলল, কোথায় যাচ্ছো?

–ডসনকে ডাকতে, অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিতে।

থিওর মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে গেল, ডসন বুড়োটা আমাকে দেখতে পারে না, ও নিশ্চয় বেজায় খুশী হবে। ও হাঁপিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করল। বলল, আমায় ছুঁয়ো না, পিঠটা ভেঙ্গে গেছে। না ছুঁলে তবু একরকম।

ডিটেকটিভটা ওর পাশে থেবড়ে বসে বলল, একটু শান্ত হও, আমরা তোমায় ঠিক টেনে তুলব।

থিও মুখ বেঁকাল।

বলল, শেষ অব্দি কাগজে নাম বেরুচ্ছে। আমার ব্যাগে একটা ফোটো আছে, প্রেসকে দিও, আমার বাবা কাগজে আমার ছবি দেখে চমকে যাবে। প্রথম পাতায় বেরুবে তো?

–হ্যাঁ। ডিটেকটিভটির মুখ কুঁচকে গেল।

–তাহলে তাড়াতাড়ি ওটা বের করে নাও। ওরা তোমায় পয়সা দেবে সেজন্যে। তুমি না নিলে ডসন নেবে। থিও জোর দিয়ে বলল।

–এইটে? ওর ব্যাগ থেকে ফোটোটা বের করে ডিটেকটিভটি ওকে দেখাল।

হ্যাঁ। প্রেসকে দিও।

এক মিনিট চুপ করে শুয়ে রইল ও। তারপর বলল, গুলির কারবারটা কি হলো এক্ষুনি?

–জানি না। গ্লেবের কাছে তো বন্দুক ছিল না, ছিল?

থিও চুপ করে থাকল। ও ভাবল ও মরে গেলেও হ্যারির মারের দাম উসুল করে তবে মরবে। তবে গুলির ব্যাপারটা ভাল করে জেনে তবেই থিও মুখ খুলবে।

–ডসন আসার আগে আমি কিছু বলব না। ওকে তাড়াতাড়ি আনো। আমি পটল তুলব।

না না, তুমি বেঁচে দশ বছর জেল খাটবে। ডিটেকটিভ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল। অন্ধকার থেকে ডসন বেরিয়ে এলো। থিওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

সাদা, যন্ত্রণা কাতর মুখটার দিকে তাকিয়ে ডসন বলল, হ্যালো, এবার সত্যিই প্যাঁচে পড়েছ, পড়নি?

থিও চোখ খুলল।

বলল, আমাকে যতক্ষণ না ঘুচ্ছো আমি ঠিক থাকবে। অ্যাম্বুলেন্স আসছে?

ডসন বলল, হ্যাঁ। থিও এই বন্দুকটা আগে দেখেছ? একটা অটোমেটিক পিস্তলের ওপর টর্চ ফেলে ওকে দেখাল।

থিও জিজ্ঞেস করল, হ্যারি গুলি ছুঁড়ছিল? কাউকে মেরেছে?

জানি না। এটা ওর বন্দুক কিনা তার ওপর সব নির্ভর করছে।

থিও চোখ বুজল, খুলল।

–ওর বন্দুক। কাকে মেরেছে?

–ঠিক বলছো?

নিশ্চয় ঠিক বলছি। আমি ওকে বন্দুক আনতে বারণ করেছিলাম, ও শুনল না। বলল যে কেউ কোনরকম বাধা দিলেই তাকে ও মারবে।

জবানবন্দী সই করবে?

থিও ঘষা কাঁচের মত চোখদুটো চেয়ে মাথা নাড়ল।

তাড়াতাড়ি কর, নইলে পটল তুলব। থিও যন্ত্রণাকাতর ভাবে বলল।

ডসন নোট বইয়ে সব লিখে নিচ্ছিল। অনেক কষ্টে থিওকে দিয়ে সই করালো।

অ্যাম্বুলেন্স যখন পৌঁছাল থিও মারা গেছে।

.

ডসন যখন পার্কওয়েয়ের লবিতে আবার ঢুকল, তখন একজন বলিষ্ঠ চেহারার ডিটেকটিভের সঙ্গে হাতকড়া লাগিয়ে হ্যারিকে লিফটে করে নামানো হচ্ছে। আরেজন ডিটেকটিভ ওর পেছনে আসছে।

অটোমেটিক পিস্তল হাতে ডসনকে দেখেই মরিয়া কন্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, আমি এ কাজ করিনি ডসন। ওটা আমার পিস্তল নয়। তুমি জান আমার কোনদিন বন্দুক কিংবা পিস্তল ছিল না। আমি এরকম কাজ করবই না। দোহাই তোমার ডসন, আমাকে খুনের দায়ে ধর না। আমি একাজ করি নি।

ডসনের নীল চোখ হ্যারির আগাপাশতলা দেখে নিল।

ডসন প্রায় ধমক দিয়ে বলল, আমাকে ধাপ্পা দিও না গ্লেব। তোমার দোস্ত থিও সব ফাস করে দিয়েছে। আমার কাছে ওর সই করা জবানবন্দীতে লেখা আছে এ পিস্তল তোমার। তুমি বড্ড চালাক হয়েছে গ্লেব, এটাই তোমার শেষ খেলা।

হ্যারি চীৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা বলেছে ও, ওকে এখানে আন, ইঁদুরটাকে দিয়ে আমি সত্যি কথা বলাবো। নিয়ে এস ওকে।

ডসন রুক্ষ গলায় বলল, ও মারা গেছে। ডিটেকটিভকে নির্দেশ দিল, ওকে নিয়ে যাও।

হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল, মরে গেছে? তারপর ও ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। দুজন ডিটেকটিভের প্রবল চেষ্টায় ওকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হল।

খবরের কাগজের সাংবাদিকরা ধস্তাধস্তি করে হ্যারির ফোটো তুলতে লাগলো। অন্ধকার বিদীর্ণ করে গাড়িটা যখন জোরে চলে যাচ্ছে তখনও হ্যারির কাতর কণ্ঠের প্রতিবাদ শোনা যেতে লাগলো।

ডসনের সহকারী গারসন এগিয়ে এল।

নীচু গলায় বলল, মিঃ ওয়েসলি এসেছেন। উনি ওপরে গেছেন।

ডসন মাথা নাড়ল।

ডসন বলল, আমি জানতে চাই, মহিলা পুলিশের কর্ডন ভেঙে কি করে ঢুকলো? কেন এভাবে ফিরে এল?

গারসন বলল, আমি মিঃ ওয়েসলিকে কোন প্রশ্ন করি নি। ওঁকে ধাতস্থ হতে একটু সময় দিলাম। আপনি ওঁকে প্রশ্ন করবেন না আমি?

ডসন বলল, আমি যাচ্ছি। আমরা বাড়িটা ঘিরে রেখেছিলাম, জানতাম গ্লেবের মতলব কি, তবু দিব্যি গ্লেব মহিলাকে খুন করলো। মহিলা সমাজে সুপরিচিত বটে। একবার কাগজগুলোকে খবরটা পেতে দাও। এখনি ওরা জানতে চাইছে, চুরিটা হবার আগেই পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হলো কেমন করে। হল্যান্ড মেয়েটার খবর কি?

ওপরে ডাক্তার ওকে দেখছে।

ডসন লিফটের দিকে এগোতে এগোতে বলল, থিওটা পিঠ ভেঙে মরেছে। জ্যাকসন মড়া আগলাচ্ছে।

ওরা লিফটে ওপরে উঠলো।

ডসন ফট্ করে জিজ্ঞেস করলো, ওয়েসলি কিভাবে নিলেন?

–একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। উনি যখন ঢোকেন তখন মৃতদেহ নিয়ে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। মৃতদেহটা সরানো হয়নি, উনি তার ওপরেই পা তুলে দিয়েছিলেন বলতে গেলে। আমি ওঁর কাছে। যেতে উনি মৃতদেহটা ছোঁয়ামাত্র ভয়ানক রকমের ধাক্কা খেলেন।

ডসন বলল, মনে হয় না দুজনের মধ্যে আর কোন ভালবাসা টিকে ছিল। ওয়েসলি হল্যান্ডকে রাখতে চাইছিলেন। যতদূর শুনেছি, ব্লানশ ওয়েসলিও বেশ দুশ্চরিত্রা ছিলেন। সে যাই হোক, বউয়ের মৃতদেহের গায়ে হোঁচট খাওয়াতে নিশ্চয়ই মজা নেই। কি বল?

ডসন সদর দরজা দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকল।

পুলিশ ফোটোগ্রাফাররা ছবি নিচ্ছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা হলে কাজ করছে।

ডসন সোজা ওয়েসলির কাছে গেল। হাতদুটো কোলের ওপর ভাজ করে বসেছিলেন।

–ডসন, বড় দুঃখের ঘটনা। আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি। ওয়েসলি নিস্তেজ গলায় বললেন।

–হ্যাঁ। আমার লোকরা ওর আসা ঠেকাতে পারলো না। কাউকে ঢুকতে বারণ করবে, এ নির্দেশ ওদের দেওয়া হয়নি। কেউ বেরোতে গেলে বাধা দেবে এই কথা ছিল। আমার লোকেরা ওঁকে দেখেন নি আসতে। যদি ওঁর পরিচয় জানতো, তবে ওঁকে বাধা দিতো। কেন ফিরে এলেন উনি?

–ওয়েসলি হতাশার ভঙ্গিতে বললেন, আমরা ঝগড়া করেছিলাম। আমার অন্ধত্বের কারণে এবং নানা কারণে আমাদের তেমন বনিবনা ছিল না। উনি খুব মদ খেতেন। থিয়েটারে যাবার আগে উনি খানিকটা মদ খেয়েছিলেন। গাড়িতে আমাদের ভীষণ ঝগড়া শুরু হলো। আমি যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি, তখন উনি নেমে চলে গেলেন। থিয়েটারে ঢোকার আগে উনি চলে গেলেন আমি বুঝিনি।

আপনি নিশ্চয় বুঝবেন একটা ভীড়, ঠেলাঠেলির মধ্যে একটা অন্ধ লোককে একা ছেড়ে গেলে তার কি অবস্থা হয়। ভাবলাম হয়তো বাথরুমে, নয়তো বারে গেছেন। কিন্তু পর্দা উঠে যাওয়ার পরও উনি না আসাতে ভাবলাম উনি আর থিয়েটার দেখতে চান না, হয়তো ক্লাবে চলে গেছেন। সহসা মনে হল, উনি হয়তো বাড়ি ফিরে গেছেন। তখন বেজায় উদ্বেগ হল। ট্যাক্সি করে এখানে পৌঁছে শুনলাম উনি...ও...।

কিন্তু কেমন করে ঢুকলেন উনি? কেউ ওঁকে ঢুকতে দেখেন নি। সেটা বলতে পারেন? ডসন জিজ্ঞেস করল।

–মনে হয়, গ্যারেজের দরজায় উনি ট্যাক্সি থামিয়েছিলেন। এ বাড়ির গ্যারেজ মাটির তলায়, দরজা আলাদা। উনি হয়তো গ্যারেজ থেকে সটান আমাদের ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলেন। উনি অনেক সময়ই তাই করতেন।

–কিন্তু গ্লেব ঢোকার পর কোন ট্যাক্সিকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি।

–হয়তো হেঁটে এসেছে। আমি ঠিক বলতে পারছি না।

ডসন ওঁর দিকে তাকাল।

বললেন, তা হতে পারে। তবে খোঁজ নিতে হবে, গ্যারেজে ওকে কেউ দেখেছে কিনা। যা যে একাজ করেছে, তাকে আমরা ধরেছি, সে পালাতে পারবে না।

ওয়েসলি আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন।

–যদি আমাকে আর দরকার না থাকে, তবে এই মর্মান্তিক আঘাতের কারণে আমি কি একটু একলা থাকতে পারি?

নিশ্চয়ই। আমরা আপনাকে বিরক্ত না করারই চেষ্টা করব। আর কিছু করতে পারি কি?

–গেরিজকে...আমার সেক্রেটারীকে যদি দেখেন, আমার কাছে আসতে বলবেন।

বলবো। ডসন দরজার দিকে এগোল।

–ওয়েসলি সতর্ক প্রশ্ন করলেন, মিস হল্যান্ড ঠিক আছে তো?

–হ্যা...একটু ভেঙে পড়েছে, তবে ঠিক আছে। আমি ওর কাছেই যাচ্ছি।

–ও কি কিছু দেখেছে?

–তাই জানতে যাচ্ছি।

–তাই বলুন। ধন্যবাদ।

ডসন একটু দাঁড়িয়ে কি ভেবে বসার ঘরে গারসনের কাছে গেল। ওকে ডসন বলল, বাড়ির নিচে গ্যারেজে মিসেস ওয়েসলিকে কেউ আসতে দেখেছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখো। ওদিকে আমাদের কোন পাহারা ছিল না। ওয়েসলির সন্দেহ মহিলা ওখান দিয়ে ঢুকেছেন।

–হ্যাঁ স্যার।

হল্যান্ড মেয়েটা কোথায়?

–নিজের ঘরে। এই প্যাসেজের শেষ ঘর স্যার।

ডসন ভারি পা ফেলে হেঁটে গিয়ে দরজায় টোকা মারল।

জুলি বিছানায় শুয়েছিল। মুখখানা অশ্রুভেজা। ডসনকে দেখে রক্তশূন্য হয়ে গেল।

সময় নষ্ট না করে ডসন জিজ্ঞেস করল, যখন গুলিটা চলে তুমি কোথায় ছিলে?

মিসেস ওয়েসলির ঘরে।

–কি হল ব্যাপারটা?

আ..আমি কিছু জানি না.আমি কিছু..দেখিনি।

ডসন ওর দিকে ভালভাবে চেয়ে বলল, দেখ বাছা, ফ্ল্যাটে তুমি আর গ্লেব ছিলে। তুমি সব খোলসা করে বলল। নইলে বিপদে পড়বে।

–কিন্তু আমি কিছু জানি না। জুলি উঠে বসল। আমি কিছু দেখি নি।

–শুনেছ তো কিছু? না শোন নি?

মিসেস ওয়েসলিকে চেঁচাতে শুনেছি। তারপরই গুলির শব্দ শুনে ছুটে যেতে.দেখলাম হ্যারি ঝুঁকে মিসেস ওয়েসলিকে দেখছে। ও তখনই রান্নাঘর থেকে এসেছে।

–শুধু এই দেখেছ। ওকে হ্যারি গুলি করেছে দেখনি?

–কিন্তু ও গুলি করেনি। ও রান্নাঘরে ছিল। ও একাজ করতে পারে না। ওর কাছে পিস্তল ছিল না। জুলি বলল।

ডসন রুক্ষ গলায় বলল, ওকে বাঁচাবার চেষ্টা কোর না। তাতে কাজ হবে না। ও না করলে, তুমি করেছে। ফ্ল্যাটে তো শুধু তুমি আর গ্লেবই ছিলে।

ভয় পেয়ে জুলি বলল, না! আমি করিনি।

ডসন ভয়াল হাসি হাসল। বলল, আমি বলছি না তুমি করেছে, তবে তোমায় এটা বোঝাতে চাইছি, মিথ্যে বললে বিপদে পড়বে।

জুলি হাতের মুঠি শক্ত করে বলল, কিন্তু আমি একেবারে নিশ্চিত যে হ্যারি একাজ করেনি, করতে পারে না। সদর ভোলা ছিল। সেখান থেকে কেউ গুলি করতে পারে।

–অদৃশ্য মানুষ? সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠলে বানামলে সিঁড়ির দুদিকে আমার লোক ছিল, ওরা দেখতে পেত। ওরা কাউকে দেখেনি।

জুলি ওর দিকে চেয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ডসন জিজ্ঞেস করলো, পিস্তলটা কি গ্লেবের হাতে ছিল?

না। মিসেস ওয়েসলির পাশে মেঝেতে, দরজার ঠিক পাশে পড়েছিল।

–ঠিক আছে। যাক, তুমি বেঁচে গেলে। থিও মরে গেছে। গ্লেব ধরা পড়েছে। ফ্রেঞ্চদের খুজছি। হুঁশিয়ার থেকো।

দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে এসে বলল, মনে রেখো তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে। এখন থেকে মামলা ওঠা অবধি সাবধানে থেকো। বুঝলে?

জুলির ঘর থেকে বেরোবার সময় গারসনের সঙ্গে ডসনের দেখা হল।

গারসন বলল, গ্যারেজে কেউ ছিল না স্যার। কাজের লোকেরা সাতটায় চলে গেছে।

ডসন ভুরু কুঁচকে বলল, যে ট্যাক্সিটায় এসেছিল, সেটার খোঁজ কর। যেভাবে ফিরে এসেছিলেন, তারমধ্যে কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল আছে। আমার মনে হচ্ছে, এদিক থেকে তদন্ত করলে খানিকটা ফল পাওয়া যাবে।

গারসন চমকে তাকাল।

কিন্তু, গ্লেবই ওকে খুন করেছে এতে কোন সন্দেহই নেই। আছে কি?

ডসন তিক্ত গন্যায় বলল, মামলা শেষ না হওয়া অবধি সন্দেহ থেকে যায়। খানিকটা খাটুনির ভয়ে কেসটা হাত ফসকে যাবে, সেটা আমি চাই না। গ্লেবকে যখন এতদিন পর ধরেছি, তখন জাল ফসকে মাছ বেরোতে দিচ্ছি না। খোঁজ নাও, মিঃ ওয়েসলির কাছ থেকে যাবার পর মিসেস ওয়েসলি কি করেছেন?

–হ্যাঁ স্যার।

কেউ লক্ষ্য করলনা, ওয়েসলির স্টাডির দরজাটাইঞ্চিখানেক খুলে গেল। গারন চলে যেতে নীরবে বন্ধ হয়ে গেল।

.

পুলিশ চলে যেতে ফ্ল্যাটটিতে একটা অস্বাভাবিক নীরবতা ফিরে এল। জুলির দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডসন গম্ভীর গলায় ওর লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে জুলি শুনতে পাচ্ছে। জুলি ভাবল, ডসন আবার ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু ডসন শুধু ওয়েসলির সঙ্গে দেখা করে, ভারী পায়ের শব্দ করে চলে গেল।

তারপর গেরিজেরও চলে যাবার আওয়াজ পেল। জুলি আস্তে আস্তে উঠে কার্পেটে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখতে লাগল।

সারা ফ্ল্যাটে এখন শূন্য গীর্জার নীরবতা।

প্যাসেজে আসতে ও ভয় পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ব্লানশ যে কোন মুহূর্তে ওর সামনে এসে দাঁড়াকেন।

এ ফ্ল্যাটে আর এক মিনিটও থাকার কথা ভাবতে পারছে না ও। ভিগো স্ট্রীটের চাবি আছে ওর কাছে। এই ভয়াবহ পরিবেশ ছেড়ে ওখানেই চলে যাবে ঠিক করলো জুলি। ব্যাগ গোছাতে শুরু করল।

ব্যাগ গোছানোর পর কিছু ভুলে গেল কিনা ও দেখছিল। হঠাৎ প্যাসেজে পায়ের শব্দ শুনে ওর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ বয়ে গেল।

ব্লানশ?

অসম্ভব উনি মারা গেছেন।

অপেক্ষা করলো জুলি। আবার কান পাতল। ইঁদুর দেওয়ালের কাঠ আঁচড়ালে যতটুকু শব্দ হয়, তার চেয়ে জোর নয় আওয়াজটা। ও দরজাটা একচুল ফাঁক করে উঁকি মারলো।

দেখল, ফ্যাকাশে, অভিব্যক্তিহীন মুখে সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওয়েসলি কার্পেটের ভিজে দাগটা দেখছেন। তারপর ঐ জায়গাটায় পা বুলিয়ে স্বাগত বললেন, ও বেঁচে থাকার যোগ্য ছিল না।

জুলির অসুস্থতা অনুভব হলো এখন। দু-হাতে মাথা চেপে ধরে ও চোখ বুজল।

কখন ওয়েসলি ঘরে ঢুকেছেন ও শুনতে পায় নি। যখন উনি কথা বললেন ও চমকে, ছিটকে, লাফিয়ে উঠল।

ওয়েসলি মৃদু কণ্ঠে বললেন, ঘাবড়ে দিতে চাই নি। দরজায় টোকা দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু অতটা মাথায় আসেনি।

জুলি চুপ করে রইল।

ওয়েসলি আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। জুলির দিকে না তাকিয়েই বললেন, এখন সব কি নীরব, শান্ত না? পুলিশের মুখে শুনলাম, তুমি ঠিকই আছে। তুমি নিশ্চয় ভীষণ ঘা খেয়েছে তাই না?

জুলি কি বলবে ভেবে পেল না।

–ডসন কি রকম অদ্ভুত রকমের আচরণ করছিল। তাই না? এবার একটু দাঁড়িয়ে জুলির দিকে তাকালেন। আবার পায়চারি করতে করতে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকলেন। বললেন, ও যেন কি সন্দেহ করছিল। ব্লানশ কেমন করে ফ্ল্যাটে ঢুকলো, তাতে কি এসে যায়? ডসন কেন তাই নিয়ে রহস্য করছে?

–আমি জানি না।

–গ্লেব ওকে গুলি করেছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। ডসনের মতলব কি আমি বুঝতে পারছি না।

জুলি বলে উঠল, হ্যারি গুলি করেনি। আমি জানি।

ওয়েসলি সতর্ক দৃষ্টিতে ঘুরে দাঁড়ালেন।

–কি বলতে চাইছ জুলি?

–হ্যারি ও কাজ করে নি। আমি জানি ও করেনি।

তুমি কি করে এত নিশ্চিত হচ্ছো?

আমি জানি ও খারাপ। কিন্তু ও কোনদিন সঙ্গে বন্দুক রাখতো না। একবার আমার সামনে মিসেস ফ্রেঞ্চ ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওর কাছে বন্দুক আছে কিনা। ও তখন বলেছিল, ও কখনন বন্দুক রাখেনি, রাখবেও না। তখন ও সত্যি কথা বলেছিল। আজ রাতে ও যখন বলল ও ব্লানশকে গুলি করে নি তখনো ও সত্যিই বলেছিল।

ওয়েসলি সামান্য কম্পিত গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি পুলিশকে একথা বলেছো?

–ডসন আমার কথা বিশ্বাস করে নি। ও বলেছে, ফ্ল্যাটে শুধু আমি আর হ্যারি ছিলাম। হ্যারি না করলে আমি খুন করেছি।

–মূর্খ! ওয়েসলি রেগে গিয়ে বলল, ও নিশ্চয় একথা বিশ্বাস করে নি।

না। ও আমায় ভয় দেখাতে চাইছিল। কিন্তু হ্যারি খুন করতে পারে না। আমি ডসনকে বললাম সদর খোলা ছিল।

–কি বললে, কি বলতে চাইছ তুমি?

–সদর খোলা ছিল। ব্লানশ ঢোকার পর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

ওয়েসলি জুলির কবজি ধরে টেনে এনে, ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, দরজা খোলার সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক আছে? কি ইঙ্গিত করছে তুমি?

ওঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে জুলি স্থির, নির্বাক হয়ে গেল।

জবাব দাও জুলি!

–আমি শুধু বললাম, প্যাসেজ থেকে কেউ ওঁকে গুলি করে থাকতে পারে।

জুলি বিরক্ত হয়ে কবজি ছাড়ানোর চেষ্টা করল। দোহাই তোমার ছেড়ে দাও। আমার ব্যথা লাগছে।

কিছুক্ষণ ওকে ধরে থেকে তারপর ওয়েসলি ওকে ছেড়ে দিয়ে মুখ ফেরালেন।

দুঃখিত। ডসন এর জবাবে কি বলল?

জুলি বসে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, অদৃশ্য মানুষের কথা কি যেন বলল। বলল, কেউ উঠলে বা নামলে সেটা পুলিশের নজরে পড়তো।

–অদৃশ্য মানুষ? ডসন এই কথা বলল?

ওয়েসলির চাউনি জ্বরো রুগীর মত। কিন্তু সহসা.উনি খুব স্বাভাবিক ভাবে হাসলেন, জুলি তুমি সাহায্য করতে চেয়েছিলে। কিন্তু ভেবে দেখ ওকে দরজা দিয়ে কেউ গুলি করতে পারে না। পুলিশ যদি ওখানে পাহারায় থাকে তবে কারোর পক্ষে সম্ভব ওখান থেকে গুলি করা?

জুলি ওঁর ভাবভঙ্গী দেখে অবাক হয়ে বলল, না, হয়ত না। কিন্তু আমি নিশ্চিত হ্যারি ও কাজ করে নি।

–গ্লেবের ওপর তোমার এ বিশ্বাস বড়ই দুঃখের। হাজার হলেও ও একটা চোর। তোমার ওপর ও কোন দয়া দেখায় নি। ব্লশকে ও যে গুলি করেনি, তার কোন প্রামাণই নেই তোমার কাছে। তুমি কি ওকে ভালবাস?

না, আমি ওকে ভালবাসি না। কিন্তু তবু বলব ও একাজ করেনি।

–এটা একটা যুক্তিগ্রাহ্য কথা হলো না। জুরি তোমার এ কথায় কান দেবে না। যাক, দেখা যাক কি হয়।

জুলি বিস্ফারিত চোখে বলল, ওকে কি ফাঁসি দেবে ওরা?

জানি না। ও কথা এখন না ভাবাই ভালো। ওকে তো এখনো আদালতেই তোলা হয় নি। ওয়েসলি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, এখানে আর একরাতও থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। তুমি পারবে জুলি?

–না।

–তাহলে, চলো নতুন ফ্ল্যাটে যাই আমরা।

ওঁর সঙ্গে থাকার কথা ভেবে জুলি শিউরে উঠল, ভাবল, এখন থেকেই বোধহয় ওদের নতুন সম্পর্ক শুরু হবে।

কিছুদিন আমি একলা থাকতে পারলে হোত। আমি কি ওখানে একা যেতে পারি না?

–সে অসম্ভব! ওঁর গলায় ধার। তুমি ভুলে যেতে পারো আমার সঙ্গে কোনদিন আলাপ হয়েছিল।

জুলি ওর দিকে কঠিন মুখে চাইল। ও ধারালো গলায় বলল, তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন আমি যাতে মুখ না খুলি, তার জন্যেই তুমি আমাকে এসব দিয়েছে? এখন আমার যা ইচ্ছে তাই করবো। আমি তোমার ঐ ফ্ল্যাট চাই না।

ওয়েসলি হাসলেন।

মৃদুস্বরে বললেন, একেবারে পাল্টে গেছ না জুলি? তুমি এখন যাকে ইচ্ছে বলতে পার আমি দেখতে পাই। আমার অন্ধত্বের ভান শুধু ব্লানশের জন্যে। এখন আর কিছু এসে

যায় না। হয়তো ভবিষ্যতে তোমাকে বিশদ ভাবে সব বলব, এখন নয়। আর কয়েক সপ্তাহ আমি অন্ধের ভান করে যাবো। তারপর দৃষ্টি ফিরে পাবো। যদি তুমি বলে বেড়াতে চাও, বোলল। কিন্তু তুমি ফ্ল্যাট, টাকা কিছুই পাবে না। ঠিকভাবে চললে তোমার সবকিছুই থাকবে।

জুলি বুঝে উঠতে পারলো না উনি ধাপ্পা দিচ্ছেন, নাকি ধাপ্পা নয়। এই অনিশ্চয়তা ওকে খেপিয়ে তুলল। ও যে কোন শর্তে ফ্ল্যাট বা টাকা আঁকড়ে পড়ে থাকতে রাজি।

–বেশ, তাহলে তুমিও চলো। ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল।

ওয়েসলি নতুন সুরে, উদ্বেল হয়ে বললেন, ভাল। চল, তাহলে নতুন করে জীবন শুরু করি দুজনে। আমি কথা দিচ্ছি ওখানে তোমায় আনন্দে ভরিয়ে রাখবো। আমি ব্যাগে কয়েকটা জিনিষ ভরে আসছি, তুমিও তৈরী হও। দেরী কোর না। কেমন?

জুলি গোছানো শেষ করল। ওয়েসলি এসে ব্যাগটা নিল।

চল। কাল গেরিজকে পাঠিয়ে দেব, ও গোছগাছ শেষ করে দেবে।

দুজনে প্যাসেজ ধরে এগোতে এগোতে কার্পেটে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখে কুঁচকে গেল। ওয়েসলি এগিয়ে লিফটের বোতাম টিপলেন।

লিফটের দরজাটা খুলে গেল। ওয়েসলি বললেন, এখান থেকে চলে যেতে ভাল লাগছে। চিরটাকাল এ জায়গাটা আমার অপছন্দ ছিল।

লিফটটা যখন নামছে, লিফটের মেঝেতে কোণের দিকে একটা জিনিষ জুলির চোখে পড়ল। ওয়েসলিও সেটা সেই মুহূর্তেই দেখলেন। দেখেই চট করে ওটা তুলে পকেটে পুরলেন। জুলি সবই লক্ষ্য করল। ওদের প্রথম সাক্ষাতের দিনে, ওঁর হাতে পরিয়ে দেওয়া সেই লিউকোপ্লাস্টের টুপিটা।

উনি ওটা লুকিয়ে ফেললেন বলে জুলি একটু বিস্মিত হল। জুলি দেখল ওঁর মুখে কিছু একটা মনের ভাব চেপে রাখার অদ্ভুত উত্তেজনার চিহ্ন। ও নিশ্চিত জানলো কালো চশমার আড়ালে চোখ দুটোতে ভয় জেগে উঠেছে।

তখন ও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা ওর মনে একটা দাগ কেটে রইল। পরে ওর এ ঘটনার কথা মনে হয়েছে।

.

হ্যারি গ্লেব যখন কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল তখন ওয়েস্ট আদালতে তোক গিজগিজ করছে। হ্যারির দিকে অতগুলো তীক্ষ্ণ চোখের নির্মম কৌতূহলের দৃষ্টি হ্যারিকে স্তম্ভিত করলো ও ভীষণভাবে নাড়া দিল। ও সঙ্কুচিত চাহনিতে একবার তাকিয়েই ম্যাজিস্ট্রেটের মাথার ওপরের দেওয়ালটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

গ্রেপ্তার হবার পর হ্যারির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। ওর ফাঁপা অহমিকার বদলে আজ, ওর চোখে বন্য, ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। হাত কাঁপছে। এখন ও ফাঁদে পড়া ভিতু একটা জন্তু, ওর নাকে মৃত্যুর গন্ধ আসছে।

এক সপ্তাহের জেল হাজতের হুকুম হওয়ার আগে ও ডসনের সাক্ষাতে শুনেছে, যে মিসেস ফ্রেঞ্চ আর ওঁর মেয়ে ডানা ওঁর হাত ফসকে সেই যে পালিয়ে গেছে, আর ধরা পড়ে নি। কোর্টের চারিদিকে তাকিয়ে ও বুঝলো ডসনের কথাটা কতখানি সত্যি কেননা ওর থেকে ক-গজ দুরেই ডানা বিপদ স্বীকার করেও হ্যারিকে দেখতে এসেছে। থিও মরে গেছে। হ্যারি ভাবল ও সবকিছু ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে গেছে। এখন ওর নিজেকে মনে হল অক্ষম, পরিত্যক্ত।

ডানা জানত ওর বিপদের সম্ভাবনা বেশি নয়। পুলিশের কাছে ওর তেমন বিশদ বিবরণ নেই। তবু সাবধানতাবশতঃ ও একটা চশমা পড়েছে, আঁটো টুপিতে ঢেকে নিয়েছে তামাটে চুল।

ডানার মনে হলো হ্যারিকে প্রেতের মতো দেখাচ্ছে। সজোরে কাঠগড়ার রেলিং চেপে ধরে ও কম্পিত গলায় উকিলের সাহায্য চাইল। ডানার বুক ফেটে যেতে লাগল কেননা ও অনেকদিন ধরে হ্যারিকে ভালবেসে এসেছে।

ডসন যখন অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে বলল, ম্যাজিস্ট্রেট তাতে সায় দিলেন। ডসন বলল হপ্তা ফুরোবার আগেই ও আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের আশা রাখে। হ্যারিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার সময়, ডানাকে ও দেখতে পেল। ডানা ওর দিকে তাকিয়ে উৎসাহের হাসি হাসলো।

ভীড় ঠেলে বেরোবার সময় ডানা ভাবল, ওরা হ্যারিকে ফাঁসি দিতে পারে না। ও খুন করেনি। থিওর কাছে বন্দুক ছিল, থিওই খুন করেছে। যেমন করে তোক হ্যারিকে এই জাল কেটে বের করতেই হবে কিন্তু কিভাবে?

চিন্তায় ডুবেও রাস্তা চলছিল। মনের গভীরে ও বুঝতে পারছিল হ্যারির জন্যে ও কিছুই করতে পারবে না।

ডানা যখন নিজের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছে, ইন্সপেক্টর ডসন তখন আফিসে পৌঁছে দেখল গারক্ষন বসে আছে।

গারসনের প্রশ্নের জবাবে ডসন বলল, এক হপ্তার হাজত হলো। তারমধ্যে ওদের ধরতে হবে। কোন খবর আছে?

মিসেস ফ্রেঞ্চ আর ডানার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। নিশ্চয় কোথাও ভালমতো গা ঢাকা দিয়েছে।

ডসন ঘোত করে শব্দ করলো।

মিসেস ওয়েসলির সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের কোন খোঁজ পেলে, যে ট্যাক্সি ওকে থিয়েটার থেকে বাড়ি এনেছিল।

মনে হচ্ছে উনি ট্যাক্সিতে যাননি। কোন ড্রাইভারই ওকে ওয়েসলির বাড়িতে এনেছে বলে খোঁজ দিতে পারছে না। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার স্যার, একজন ড্রাইভারের পক্ষে একজন অন্ধলোককে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

–যাক্, ও এখন ছেড়ে দাও, মিসেস ওয়েসলির গতিবিধির কোন খোঁজ পেলে?

–তেমন কিছু পাইনি স্যার। থিয়েটারের দারোয়ান দেখেছে উনি ট্যাক্সি থেকে নেমে থিয়েটারে ঢুকলেন, ওয়েসলি ভাড়া মেটাচ্ছেন। থিয়েটারে বহুবার অভিনয়ের সুবাদে দারোয়ান ওঁকে ভালই চিনত। উনি বারে চলে গেলেন। দারোয়ান ওয়েসলিকে ঢোকার দরজা দেখিয়ে বলে দেয় মিসেস ওয়েসলি বারে গেছেন। ওয়েসলি শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। উনি ঢুকে গেলেন।

–কেন শুনতে পেলেন না, আমি জানি না। উনি তো কালা নন?

মিসেস ওয়েসলি বারে গেলেন। বারের মেয়েটার মনে হচ্ছিল ওঁর মেজাজ খারাপ আছে, বলতে গেলে কোন কথাই হয়নি ওঁর সঙ্গে। ওঁর এই আচরণে মেয়েটি খুশী হয় নি। তারপর উনি তিনটে ব্র্যান্ডি খান। প্রথম ঘণ্টা পড়ার মিনিটখানেক আগে বার থেকে বেরিয়ে যান। দারোয়ানটি অবাক হয়ে যায়। উনি পিকাডিলি সার্কাসের দিকে চলে যান। ফ্ল্যাটে গিয়ে না পৌঁছনো অবধি কেউ ওঁকে দেখেন নি।

হয়ত আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে গেছেন উনি। ট্যাক্সি পাওয়া অত সোজা নয় আজকাল।

–তাই মনে হয় স্যার। উনি যদি বেরিয়েই ট্রেন পেয়ে থাকেন তবে অবশ্য যে সময়ে পৌঁছেছেন, তা সম্ভব।

–ওয়েসলির কথা বলল। তার জবানবন্দীর সঙ্গে যা ঘটেছিল, তার মিল হচ্ছে কি রকম?

–ঠিকই মিলছে স্যার, তবে দুটো কথা। একটা হচ্ছে, দারোয়ানটি ওঁকে বলে মিসেস ওয়েসলি বারে কিন্তু উনি বলেছেন উনি জানতেন না মহিলা কোথায় গেছেন। অবশ্য এমন হতে পারে, উনি ওঁর কথা শোনেন নি। কিন্তু পর্দা উঠে যাবার পর উনি যখন থিয়েটার থেকে বেরোন, দারোয়ান একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে চায়। এখানে আমার একটু গোলমাল লাগছে। উনি জবানবন্দীতে বলেছেন, আমার মনে হল উনি এখানে ফিরে আসতে পারেন, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সি পেতে আমাকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। অবশেষে একজন দয়াপরবশ হয়ে আমাকে ট্যাক্সি ডেকে দেয়।

হা, বেশ ভালই গোলমেলে। দারোয়ান যদি ট্যাক্সি ডেকে দিতে চায়, উনি যদি ভয়ই পেয়ে গিয়ে থাকেন, তবে দারোয়ানকে ট্যাক্সি ডাকতে দিলেন না কেন? উনি তো জানতেন উনি নিজে নিজে ট্যাক্সি ধরতে পারবেননা। আমি আবার ওনার সঙ্গে কথা বলে দেখব। এখন উনি সেই হল্যান্ড মেয়েটির সঙ্গে ভিগো স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন।

গারসন হাসলো।

মেয়েটি তো দেখতে বেশ খাসা স্যার। একটি মেয়ের যদি সুন্দর মুখ আর ভালো শরীর থাকে, তবে ফুর্তিবাজরা তার মগজে কি আছে কি নেই তা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না কেউ আজকাল।

–যে অন্ধ তার আবার সুন্দর মুখের মূল্য কি?

গারসন চোখ পিটপিট করলো।

–হ্যাঁ, তা তো বটেই স্যার। আমি সে কথা ভেবে দেখি নি স্যার। না ঠিকই বলেছেন। তবে ব্যাপারটা কি?

–ওদের ওপর আমি নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি। ওয়েসলি ঐ মেয়েটার পেছনে টাকা ঢেলে যাচ্ছেন। নাইট ক্লাব, থিয়েটার, মদের পার্টি, রেস্টুরেন্ট, নাচের আসর, রেস সর্বত্র দেখা যাচ্ছে ওরা একসঙ্গে যাচ্ছেন। উনি কারখানাতেও যাচ্ছেন না। আমি জানতে চাই আসল ব্যাপারটা কি?

ব্লাকমেইল?

–মনে হয় না। ব্ল্যাকমেইল হলে মেয়েটা সবসময় ওর সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরবে কেন? ব্লকমেইলারও নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাইবে। জুলিকে ঠিক সে টাইপের মেয়ে বলে মনে হয় না।

–হয়ত ওরা প্রেমে পড়েছে স্যার।

–হয়তো। জানি না। যাই হোক গারসন, তুমি দেখ ফ্রেঞ্চরা কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। ওদের পেছনে লেগে থাকো। ট্যাক্সি ড্রাইভারের খোঁজ করে চলল। এখনও সময়

আছে, হয়তো একজন কিংবা দুজন এগিয়ে এসে যোগাযোগ করবে। আমি এদিকে ওয়েসলির সঙ্গে কথা বলবো।

গারসন চলে গেলে ডসন ঘড়ি দেখলেন, তিনটে বেজে কয়েক মিনিট। ভাবলেন পাঁচটার পর ওয়েসলির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। উনি বাড়িতে না থাকলে জুলির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে।

.

ওয়েস্ট এন্ডে বেনটন একা একটা ছোট অথচ আরামপ্রদ ফ্ল্যাটে দিব্যি থাকেন। পুরোনো ফ্যাশনের বাড়িটায় তিনটে ফ্ল্যাট, তিনটেই অবিবাহিত একলা মানুষের জন্যে।

রবিবারে সকাল নটায়, অন্যান্য দিন সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়। বেনটন সকাল সাড়ে সাতটায় উঠে সবকিছু সেরে সকাল নটায় কারখানায় চলে যায়।

ওর ব্রেকফাস্ট হলে জোলো দুধের সঙ্গে কর্নফ্লেক্স, মাখন, টোস্ট, কড়া কফি। কখনো এর ব্যতিক্রম হয় না। খাওয়া হয়ে গেলে ট্রের-ওপরে পড়ে থাকা আঁটা মোড়কের খবরের কাগজ নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়তে শুরু করে।

ব্লশের মৃত্যুর পরের দিন অভ্যাস মত স্নান করেছে, দাড়ি কামিয়েছে, প্রাতঃরাশ খেয়েছে। মনে তখন দুটো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, ব্লানশ আর টাকা।

ব্লানশকে ও বহুবার স্টেজে দেখেছে দূর থেকে, মুগ্ধ হয়েছে। তবে প্রথম ভাল করে দেখে বেনটন, বিয়ের সময়ে। ওয়েসলি বিয়ের কথা ওকে আগে কিছুই বলেনি। অনেক বছর ওরা দুজনে ছিল কারখানার অংশীদার। একদিন ওয়েসলি-বেনটন এয়ারক্রাফট ফ্যাকটরি ছিল একটি ছোট, পরীক্ষামূলক, কল্পনামাত্র। দুজনের এক প্রচেষ্টায় আজ সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে চারশো একর জুড়ে মেশিনের দোকান, রানওয়ে আর হ্যাঙারের জঙ্গল। উদ্যোগটা ওয়েসলির তবে বেনটনের অবদানও কম নয়।

এই চুপচাপ, ফ্যাকাশে লোকটার সংগঠন ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। প্রায় বছর আগে একদিন ওয়েসলি বেনটনের অফিসে ঢুকে ওঁর বিয়ের খবর জানালেন। বেনটন অভিনন্দন জানালো এবং মনে মনে কৌতূহল হল বউ দেখবে বলে। ভাবলো, দুনিয়ার কোন্ মেয়ে ঐ নাক উঁচু ওয়েসলিকে বিয়ে করছে! হয়তো কোন ঘোড়ামুখো মেয়ে। কিন্তু ওয়েসলি যখন ওকে ব্লানশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ও প্রবল ধাক্কা খেল মনে।

বেনটন ছিল দুশ্চরিত্র। স্কুলে পড়ার সময় বেনটন একটা অত্যন্ত নোংরা কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে। সর্বসমক্ষে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়। নেশাখোরদের আফিমের মত, বেনটনের কাছে মেয়েরাও তেমনিই প্রয়োজনীয় ছিল।

ব্লানশকে কাছ থেকে দেখার পর ব্লানশ ওকে কাত করে ফেলল। ওর সঙ্গ কদিন পেতে না পেতেই ব্লানশের মদির, জাব আকর্ষণ বেনটনের ভেতরে থাবা বসালো। এ শুধু ক্ষণিকের মোহ নয়, সুন্দরী মেয়ের প্রতি সামান্য কামনা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি, গভীর প্রেমের অনুভূতি।

–ওয়েসলি যখন রয়্যাল এয়ারফোর্সে নাম লেখালেন, বেনটন তার অনুপস্থিতির সদ্বব্যহার করতে ইতস্ততঃ করলো না। ব্লানশের ততদিনে প্রচুর মদ খেয়ে শরীরে ও মনে পচন ধরে গেল। মদ বেনটনকে কাবু করতে পারলো না।

বেনটন অবাক হয়ে গেল যে ব্লানশের প্রতি ওর মোহ, ওর অনুভূতি এমনই প্রবল হয়েছে যে একবার ঘনিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সঙ্গ-তৃষ্ণায় টান ধরছে। টাকা থাকলে ও ব্লানশকে বিয়ে করত। ব্লানশ ওকে টাকাপয়সার সুব্যবস্থা করতে বললো।

এক বিকৃত যৌনকামনা ক্রমশঃ এক অদ্ভুত ধরনের গভীর প্রেমে দাঁড়াল। বেনটনের কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না। ওর মধ্যে কি যেন ছিল, পুরুষরা ওকে অবিশ্বাস করতো। ব্লানশই ছিল ওর একমাত্র সঙ্গী।

কাগজ খুলে ব্লানশের ছবি আর খুনের খবরটা পড়ে বেনটন মড়ার মতো স্থানু হয়ে বসে রইল।

কাগজটা আঁকড়ে, চোখ বুজে নিশ্চল বসে রইল বহুক্ষণ। ওর মন যেন পঙ্গু হয়ে গেল। যখন একটু নড়তে পারলো সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢেলে খেয়ে ফেলে আবার গ্লাস ভরে ফেলল। ও আবার খবরটা পড়লো আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

পরে ও ওয়েসলির ফ্ল্যাটে ফোন করলো, কিন্তু কোন উত্তর পেল না। কারখানায় ফোন করে জানতে পারলো ওয়েসলি তখনো পৌঁছননি। কিছুই করার ছিল না ওর। ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

একঘণ্টা বাদে ওয়েসলি ফোন করে কাঠ কাঠ, ভাবলেশহীন গলায় বলল, আমি কিছুদি কারখানায় আসব না, তুমি আশা করি চালিয়ে নিতে পারবে। জরুরী কাজ কিছু নেই, তোমার আমাকে দরকার পড়লে ক্লাবে খোঁজ কোর।

ওয়েসলি হঠাৎ সব দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন দেখে বেনটন স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্লানশের মৃত্যুতে ও কি আঘাত পেয়েছে।

বেনটন ভেবেছিল কোন ছুতো দেখিয়ে ক-দিনের ছুটি নেবে। কিন্তু তা সম্ভব হল না।

হ্যারি গ্লেব যখন ওয়েস্ট লন্ডন আদালতে হাজিরা দিল, বেনটন সেদিন হাজির ছিল। হ্যারির মুখে যন্ত্রণা আর ভয় দেখে ও খানিকটা স্বস্তি পেল।

সেদিনই সন্ধ্যায় ও জারমিন স্ট্রীটে সেগেত্তির রেস্টুরেন্টে গেল।

সেগেত্তি ওর দিকে আসতে ও বলল, আমার বাঁধা টেবিল। ওর কটা চোখে বিষাক্ত চাহনি, বলল, আমি বেশিক্ষণ থাকব না।

সেগেত্তি বলল, অবশ্যই মিঃ বেনটন, ফাঁকা টেবিলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে নীচু গলায় বলল, বেচারি ম্যাডাম! ওঁর অভাব আমাদের বড় মনে হবে। কি ভয়ানক, পৈশাচিক ব্যাপার।

বেনটন বসলো।

ও সেঁকো সামন মাছের ফরমাশ দিয়েও খেল না। ব্লানশের প্রিয় ব্র্যান্ডি নিল এক বোতল। বোতলের ব্র্যান্ডি দ্রুত কমতে লাগল, আর ও চিন্তায় ডুবে গেল। খেয়ালও করল না যে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ ওর দিকে তাকিয়ে। টের পেল বেশ নেশা ধরেছে, পরোয়া করল না। ভেতরের তিক্ত, কঠিন প্রতিরোধটা ব্র্যান্ডির প্রভাবে আলগা হলো।

হঠাৎ ও ওয়েসলি আর জুলিকে ঢুকতে দেখল। জুলিকে চিনতে পারলো না। শুধু দেখলো একটা মেয়ে, পরনে আগুনরঙা সান্ধ্য পোষাক, উজ্জ্বল কাঁধ অবধি নামানো। গলায় ঝমকে হীরের হার। মেয়েটির দিকে কোন মনোযোগ না দিয়েই ও শুধু ওয়েসলিকে দেখতে লাগল। ও নিজেকেই প্রশ্ন করলো, ওয়েসলি কি করে এটা পারলেন? স্ত্রীনৃশংসভাবে খুন হবার পাঁচদিনের মাথায় উনি রেস্টুরেন্টে একটা মেয়েকে নিয়ে আসতে পারলেন কিভাবে? এইজন্যই কি উনি কারখানায় যাচ্ছেন না? এই মেয়েটির সঙ্গে বসবাস করছেন? মেয়েটি কে?

হঠাৎই ও রক্তরঙা চোখ দুটো জুলির দিকে ফেরালো। কোথায় দেখেছে ওকে? সহসা আড়ষ্ট হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লো ও। জুলি! ব্লশের চাকরানী! চোখ মুছে আবার তাকালো। গাউনটা ওর চেনা। গাউনটা পরে জুলিকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না বটে কিন্তু ও যে জুলিই তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

ঐ গাউনটা ব্লানশ বিয়ের দিন পরেছিল। গাউনটা বেনটনের মনে ওদের প্রতিটি প্রেমের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। ঐ হীরে, ঐ গাউন, এসব তো ব্লানশের! ওয়েসলি ওর চাকরানীকে ব্লানশের জিনিষ দিয়ে সাজিয়ে ওর প্রতি চরম অবমাননা করেছে। ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। উঠে দাঁড়ালো ও। শ্বাসরোধকারী পৈশাচিক ক্রোধে জ্বলে উঠল।

বেনটন অস্পষ্ট ভাবে বুঝল, কেউ ওর একটা হাত ধরেছে, মোলায়েম গলায় ওর অসুস্থ লাগছে কিনা জিজ্ঞেস করছে। নোংরা গালাগালি করে ও হাতটা ছুঁড়ে ফেলল। তারপর আড়ষ্ট পায়ে, জ্বলন্ত চোখে ওয়েসলির টেবিলের কাছে গেল।

চেয়ারে বসে রেস্টুরেন্টের সব লোক দেখতে লাগল, বেনটন ওয়েসলির টেবিলের সামনে থামলো। জুলির দিকে কম্পিত আঙুল তুললো।

ভাঙা, উন্মত্ত গলায় ও চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ নোংরা কুত্তীটাকে তোমার স্ত্রীর পোষাক খুলে ফেলতে বলো। জুলির দিকে তাকিয়ে বলল, কোন আস্পর্ধায় পরেছিস তুই? ঝি কোথাকার?

ওর হাতটা হীরের নেকলেশটা ছিনিয়ে নিতে গেল কিন্তু জুলি ওর হাতটা মেরে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ওয়েসলি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পাশের টেবিলে এক হোমরা-চোমড়া আর্মি অফিসার বসেছিল। সে সামনে লাফিয়ে পড়ে বেনটনের মুখে উল্টো হাতের একটা চড় মেরে ওকে ছিটকে ফেলে দিলো।

অফিসারটি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মাতাল, শুয়োর কোথাকার!

দুজন ওয়েটার ছুটে এল। ওরা বেনটনের হাত ধরলো। মনে মনে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সেগেত্তি ওদের ইশারা করল, বেনটনকে নিয়ে যেতে।

বেনটন ক্ষ্যাপার মত ধস্তাধস্তি করতে করতে বলতে লাগল, আমায় ছেড়ে দাও। হাত সরাও! ওরা বেনটনকে দরজার দিকে টানতে লাগল। তারপর ওর গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল, ও ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

সেই কান্নার দমকে সবাই হিম হয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে, বকতে বকতে, দুজন ওয়েটারের সঙ্গে ও বেরিয়ে গেল। কাঁচের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।